তাহরীর ম্যাগাজিন

সফর-রবিউল আওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী | নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কি হবে: তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাকি ইসলাম?

পৃষ্ঠা : ০২

হে মুসলিমগণ! রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে: আরাকানকে মুক্ত করতে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করা

পৃষ্ঠা : ০৪

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নির্বাচন

পৃষ্ঠা : ০৫

হে মুসলিম তরুণ! আপনি কি নিখোঁজ?

পৃষ্ঠা : ০৭

খিলাফত এবং এর ফিকহ্ সম্পর্কে হানাফী আলেমগণের মতামত

পৃষ্ঠা : ১৬

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়:

| জন কেরির ঢাকা সফরের বিশেষ তাৎপর্য | আমরা এক উম্মাহ্ এবং এক হৃদয় | ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: ০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | htmedia.bd@outlook.com

সূচীপত্র :

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কি হবে: তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাকি ইসলাম?

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে, কখনও আওয়ামী লীগ কর্তৃক তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে, আবার কখনও বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টি কর্তৃক অন্যান্য শ্লোগাণের নামে। তথাপিও মহান ইসলামী উম্মাহ্'র অংশ, এদেশের মুসলিমদেরকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণ হতে বিচ্ছিন্ন রাখা যায়নি...

পৃষ্ঠা : ০২

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে: আরাকানকে মুক্ত করতে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করা

পৃষ্ঠা : ০৪

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নির্বাচন

পৃষ্ঠা : ০৫

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর ছাত্র সদস্যবৃন্দ

হে মুসলিম তরুণ! আপনি কি নিখোঁজ?

১ জুলাই, ২০১৬, গুলশানে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, কারণ আমরা প্রথমবারের মত বাংলাদেশে জিম্মি পরিস্থিতি এবং সেইসাথে বহু দেশী-বিদেশী নাগরিকের নৃশংস হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করলাম...

পৃষ্ঠা : ০৭

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী হন তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৬০]

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং সংকল্পের গুণে মুজাহিদগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্যায় এবং যুলুমের বাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে বিজয় অর্জন করেছেন; যদিও কুফরের মোড়ল মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোট, তার দালাল সিরিয়ার যালিম, তার মিত্র রাশিয়ান ফেডারেশন, মুজাহিদগণের অবস্থান এবং সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে উন্মত্ত বোমা হামলা চালিয়েছে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে গুড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে...

পৃষ্ঠা : ০৯

নিবন্ধ:

খিলাফত এবং এর ফিকহ্ সম্পর্কে হানাফী আলেমগণের মতামত

পৃষ্ঠা : ১৬

অন্যান্য:

- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: জন কেরির ঢাকা সফরের বিশেষ তাৎপর্য – বিশ্বব্যাপী আমেরিকা কর্তৃক পরিচালিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নয়া ক্ষেত্র হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ — পৃষ্ঠা : ০৬
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হে মুসলিম সেনাবাহিনী! আলেপ্পোর শিশুদের অনাহার এবং হত্যাকান্ডও কি তোমাদের জন্য তাদের রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়?!!! — পৃষ্ঠা : ১০
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: "আর তুমি কখনও মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বেখবর। তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।" — পৃষ্ঠা : ১১
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ লেবানন -এর পক্ষ থেকে বৈরুতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস বরাবর চিঠি হস্তান্তর — পৃষ্ঠা : ১২
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: ইহুদী রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন করুন – ইসরাইলী বিমান বাহিনীর সামনে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শন করা প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতার শামিল — পৃষ্ঠা : ১৩
- প্রেসবিজ্ঞপ্তি: আমরা এক উম্মাহ্ এবং এক হৃদয় — পৃষ্ঠা : ১৪
- ধারাবাহিক : খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা অথবা এর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ — পৃষ্ঠা : ১৮
- ধারাবাহিক : খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ (শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা) — পৃষ্ঠা : ২০
- বই অনুবাদ : ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পৃষ্ঠা : ২৪

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কি হবে: তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নাকি ইসলাম?

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে, কখনও আওয়ামী লীগ কর্তৃক তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে, আবার কখনও বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টি কর্তৃক অন্যান্য শ্লোগাণের নামে। তথাপিও মহান ইসলামী উম্মাহ্'র অংশ, এদেশের মুসলিমদেরকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণ হতে বিচ্ছিন্ন রাখা যায়নি। এবং বিশেষ করে, এই শতাব্দীর শুরু থেকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামের পক্ষে গণজোয়ার, ব্যাপক প্রসার ও জনসমর্থন, এবং ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ড প্রচন্ড গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং ইসলামী শাসনের (খিলাফত) দাবী একটি গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। যা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডার শক্তিসমূহ, মার্কিন ও তার মিত্ররা, এবং তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত দালাল শাসকেরা শঙ্কিত; এবং ইসলাম যাতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য তারা একত্রে কাজ করেছে, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করাসহ কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখেনি। তারপরও এই গণজোয়ারকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বরং ইসলামের অগ্রযাত্রা এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কাজ সকল বাধা পেরিয়ে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তাই যখন গুলশান হামলা সংঘটিত হলো, তখন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে একটি নতুন গতি প্রদান করতে তারা এটাকে বিশাল সুযোগ হিসেবে লুফে নিল।

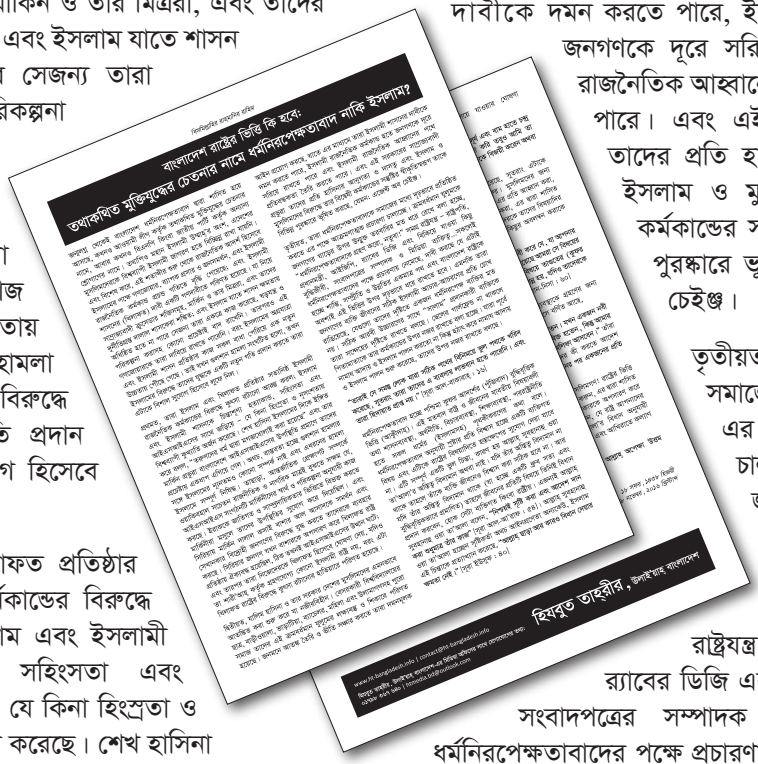

প্রথমত, তারা ইসলাম এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার সত্যনিষ্ঠ ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো আরম্ভ করল; ইসলাম এবং ইসলামী শাসনকে চিন্তাশূণ্য হত্যাকান্ড, সহিংসতা এবং আইএসআইএসের সাথে জড়িয়ে – যে কিনা হিংস্রতা ও নৃসংশতায় বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছে। শেখ হাসিনা ইসলামের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "তরুণদের ধর্ম দ্বারা মগজধোলাই করা হয়েছে" এবং তার মার্কিন প্রভুরা বাংলাদেশে আইএসআইএসের উপস্থিতি প্রমাণে তাদের প্রচেষ্টায় একধাপ এগিয়ে গেল। অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে গুলশান হামলার সঙ্গে ইসলামের ন্যূনতমও কোনো সম্পর্ক নাই এবং এধরনের হামলা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সচেতন রাজনীতিক ও নাগরিক মাত্রই বুঝতে সক্ষম যে, আইএসআইএস সংগঠনটি মার্কিনীদের স্বার্থ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। ইরাককে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করতে মার্কিনীরা মসুলে তাদের উপস্থিতির সুযোগ করে দিয়েছিল। এবং সিরিয়ায় মার্কিন দালাল কসাই বাশার আল আসাদকে সমর্থন এবং সেখানকার বিদ্রোহী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদেরকে ব্যবহার করছে। সিরিয়ার জনগণ যখন বাশারকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ঠিক তখনই আইএসআইএসের উত্থান ঘটে; এবং তারপর তারা নিজেদেরকে খিলাফত হিসেবে ঘোষণা দেয়, যদিও তা শারী'আহ্ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয়, বরং এটা খিলাফত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যালিম হাসিনা ও তার সরকার দেশের মুসলিমদের এমনভাবে আতঙ্কিত করা শুরু করে যা নজীরবিহীন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বাড়ীওয়ালা, ভাড়াটিয়া, ব্যাচেলর, মহিলা এবং উলামাগণসহ পুরো সমাজ তাদের এই ক্রমবর্ধমান যুলুমের লক্ষ্যবস্তু ও শিকারে পরিণত হয়েছে। জনমনে আতঙ্ক তৈরি ও ভীতি সঞ্চার করতে তারা দমনমূলক আইন প্রয়োগ করছে, যাতে এর মাধ্যমে তারা ইসলামী শাসনের দাবীকে দমন করতে পারে, ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে এবং ইসলামী রাজনৈতিক আহ্বানের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। এবং এই সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা তাদের প্রতি হাসিনার আনুগত্য ও দাসত্ব এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষী কর্মকান্ডের সন্তুষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করছে, যেমন: এজেন্ট অব চেইঞ্জ।

তৃতীয়ত, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সমাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এর পক্ষে আক্রমণাত্মক প্রচারণা চালাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান যুলুমকে জনগণের ঘাড়ের উপর উন্মুক্ত তরবারির মত ধরে রেখে বলা হচ্ছে, "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ করো, নতুবা!" সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র – রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, আইজিপি, র‍্যাবের ডিজি এবং বিকিয়ে যাওয়া কিছু বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব...সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছে, দাবী করছে যে এটাই হচ্ছে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নতির একমাত্র পথ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবশ্যই এই ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে। এমনকি তারা জনগণের ব্যক্তি জীবনের সঠিক ইসলামী আচার-আচরণের প্রতি চোখ রাঙিয়েছে, যেগুলো তাদের দৃষ্টিতে একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির মত নয়। সঠিক আরবী উচ্চারণের সাথে "সালাম" প্রদানকারী ব্যক্তিকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে রাখতে বলছে। ছেলের গার্লফ্রেন্ড না থাকলে পিতামাতাকে তার কর্মকান্ডের উপর নজর রাখতে বলা হচ্ছে। যারা পূর্বে নামায আদায় ও ইসলাম পালন করতো না কিন্তু হঠাৎ করে নামায আদায় ও ইসলাম পালন শুরু করেছে, তাদের উপর নজর রাখতে বলছে।

"তারাই সে সমস্ত লোক যারা সঠিক পথের বিনিময়ে ভুল পথকে খরিদ করেছে, সুতরাং তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি। এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত নয়।" [সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৬]

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে পশ্চিমা কুফর আদর্শের (পুঁজিবাদ) বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি (আক্বীদাহ্)। এই মতবাদ রাষ্ট্র ও জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলী তথা শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি হতে সকল ধর্মের (ইসলামসহ) পৃথকীকরণের কথা বলে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অনুযায়ী স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং এটিকে রাষ্ট্রের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়া যাবে না। এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল চিন্তা, কারণ হয় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অস্তিত্ব বিদ্যমান অথবা নাই। যদি তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাঁকে ব্যক্তি জীবনেও বিশ্বাস করা সঠিক হবে না। আর যদি তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে (যা হচ্ছে একটি ধ্রুব সত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রমাণিত) তাহলে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তিনিই বিধান প্রদান করবেন, হোক সেটা ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয়। এজন্যই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"নিশ্চয়ই সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা শুধুমাত্র তাঁর কাজ"** [সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪]। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা অথচ আইনপ্রণেতা অন্যকেউ, ইসলাম এই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, **"আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।"** [সূরা ইউসুফ : ৪০]

ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে, **"আর আসমান এবং জমিনের যাবতীয় কর্তৃত্ব শুধু আল্লাহ্'র জন্য"** [সূরা আলি-ইমরান: ১৮৯]। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মত নয় যারা বলে যে, "রাজার যা প্রাপ্য রাজাকে দাও এবং ঈশ্বরের যা প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।" বরং, রাজা, তার সিংহাসন, তার রাজত্ব এবং এর অন্তর্ভূক্ত সবকিছুই আল্লাহ্'র নির্দেশের আওতাধীন বিষয়। ইসলাম এটা গ্রহণ করে না যে, শুধুমাত্র মসজিদগুলো আল্লাহ্'র জন্য এবং সমগ্র রাষ্ট্র হচ্ছে শেখ হাসিনার জন্য। এটাও গ্রহণ করে না যে, শুধুমাত্র নামায ও রোযা সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ্'র এবং সরকার, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শেখ হাসিনার। এই ধরনের চিন্তাকে গ্রহণ করা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাথে শরিক করার শামিল,

"তাদের কি আল্লাহ্'র সাথে এমন কোনো শরিক রয়েছে, যারা তাদের জন্য জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?" [সূরা আশ-শুরা : ২১]

আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা দাবী করে যে, রাষ্ট্র যদি একটি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা হবে অন্যান্য ধর্মের লোকদের উপর অত্যাচারের কারণ। ইসলামের ক্ষেত্রে সেই দাবী অপ্রযোজ্য ও ভিত্তিহীন। কারণ, সকল ধর্মের জনগণ ইসলামী শাসনের অধীনে একত্রে বসবাস করেছিল এবং করবে, এবং কাউকে তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি পালনে বাধা প্রদান করা হয়নি এবং হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি ইহুদী ধর্মের উপর রয়েছে এবং যে ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্মের উপর রয়েছে, তাদের কাউকেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগে বাধ্য করা যাবে না।"

এবং তিনি (সাঃ) বলেন,

"যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিম ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করে অথবা তার কোন অধিকারকে খর্ব করে অথবা তার উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা সম্মতি ছাড়া তার কাছ থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে অবস্থান নিব।"

আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থনে তারা সূরা আল-কাফিরূনের **"লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন"** অর্থাৎ **"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার ধর্ম আমার জন্য"** আয়াতকে উদ্ধৃতি করে, কিন্তু এই আয়াতের অর্থ তারা যা দাবী করে তার বিপরীত। তারা বলে বেড়ায় যে, এই আয়াতের অর্থ "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" এবং রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবেনা। এই পবিত্র আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, ইসলাম কাফেরদের ধর্ম বিশ্বাস হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা। এই আয়াতটি নাযিল হয় যখন মক্কার গোত্র প্রধানরা ইসলাম এবং তাদের ধর্মের মধ্যে আপোষের প্রস্তাব দেয় তখন কুফরকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান স্বরূপ। তিনি (সাঃ) তাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ইসলামকে মানবজাতির জন্য একমাত্র সঠিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে বিজয়ী করা পর্যন্ত ইসলামের রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যেমন তিনি (সাঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্'র কসম, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দিত যাতে আমি এই কাজকে পরিত্যাগ করি তবুও আমি তা পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই দ্বীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি একাজ করতে করতে মৃত্যুবরণ করি।"

ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সুতরাং এটাকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে কুফর। মুসলিমদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বিশ্বাস করা, গ্রহণ করা, এর প্রতি আহ্বান করা, এর প্রচার করা, এর দ্বারা জীবন পরিচালনা করা, এর দ্বারা শাসিত হওয়াকে মেনে নেয়া নিষিদ্ধ। ইসলাম মুসলিমদেরকে তাদের বিষয়াদির বিচার-ফয়সালায় ইসলামী শাসন ব্যতীত অন্যকিছুর অবলম্বন করাকে নিষিদ্ধ করেছে।

"আপনি কি তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেননি যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি এবং যা আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি নাযিল হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান আনলাম, অথচ তারা বিবাদমান বিষয়ে তাগুতের (কুফর শাসনব্যবস্থার বিচারক, শাসক, নেতৃবৃন্দ) শরণাপন্ন হয়, যদিও তাদেরকে তা প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" [সূরা আন-নিসা : ৬০]

ইসলাম, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে খিলাফত ব্যবস্থাকে গ্রহণের জন্য মুসলিমদের নির্দেশ প্রদান করেছে। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে,

"বনী ইসরাঈলকে যুগে যুগে নবীগণ শাসন করতেন। যখন একজন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন, কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই। শীঘ্রই বহুসংখ্যক খলিফা আসবেন।" তাঁরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, **"তোমরা একজনের পর একজনের প্রতি বাই'আত প্রদান করবে..."**

আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, হে মুসলিমগণ! রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কুফর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করুন, এর দ্বারা শাসিত হওয়াকে নীরবে মেনে নিবেন না, বর্তমান সরকারকে অপসারণ করে ইসলামের ভিত্তিতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন, যে রাষ্ট্র আপনাদের সকল বিষয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে, আপনাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে, ইনশা'আল্লাহ্।

"এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কে?" [সূরা আল-মা'য়িদাহ্ : ৫০]

১৮ সফর, ১৪৩৮ হিজরী
১৮ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

হে মুসলিমগণ! রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে

আরাকানকে মুক্ত করতে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে আমাদের সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করা

মিয়ানমার সরকার একদিকে যেমন রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, অঙ্গহানী ও অগ্নিসংযোগের মতো নৃসংশতা চালাচ্ছে। আর অন্যদিকে বাংলাদেশের নিষ্ঠুর হাসিনা সরকার তাদেরকে আশ্রয় না দিয়ে এবং তাদেরকে বন্দুকের নলের মুখে পুশব্যাক করে হত্যাকারীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে এই গণহত্যায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নির্দেশের তোয়াক্কা করেনি।

"অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।" [সূরা আল-আনফা'ল : ৭২]

সরকার তার ঘৃণ্য পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলছে যে, এসব অসহায় জনগণ নাকি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি! কিসের জাতি? কিসের জাতীয় নিরাপত্তা? যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"মুসলিমরা অন্যান্য জাতিদের থেকে পৃথক এবং এক উম্মাহ্।"** জাতিরাষ্ট্র নামক চিন্তা একটি কুফর চিন্তা। ইসলাম জাতীয়তাবাদকে নিষিদ্ধ করেছে; ইসলামে এমন চিন্তার কোনো স্থান নাই যে চিন্তা মুসলিমদের জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত করে রাখে, আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের ভিত্তিতে, কোনোটা বাঙালীদের জন্য, কোনোটা পাকিস্তানীদের জন্য, কোনোটা আবার সিরিয়ান কিংবা জর্ডানীদের জন্য, ইত্যাদি। মুসলিমরা এক উম্মাহ্, তাদের রাষ্ট্র এক, তাদের ভূ-খন্ড এক, তাদের যুদ্ধ এক এবং তাদের শান্তিও এক। তাই উদাহরণস্বরূপ যখন আফগানিস্তানের মুসলিমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন পাকিস্তানের মুসলিমদের তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। ঠিক একইভাবে, যখন আরাকানের মুসলিমরা আজ আক্রান্ত তখন বাংলাদেশের মুসলিমদের তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

যাইহোক, সরকার কর্তৃক "জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার" বুলি প্রকৃতপক্ষে জনগণের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। খুব বেশীদিন গত হয়নি যখন শেখ হাসিনা কাশ্মির ইস্যুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতকে সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছিল। তখন জাতীয় নিরাপত্তার কোন বিবেচনা থেকে সে তা বলেছিল? প্রকৃত সত্য হচ্ছে হাসিনা সরকার ইসলাম এবং মুসলিমদের শত্রু। সে এবং তার সরকার দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। সুতরাং তাদের পক্ষে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

হে মুসলিমগণ!

আপনাদের রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের উদ্ধার ও রক্ষা করতে হলে শত্রু রাষ্ট্র মিয়ানমারের সরকার ও হিংস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কবল হতে আরাকানকে মুক্ত করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে খিলাফতের নেতৃত্বের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জিহাদে প্রেরণ করতে হবে। সরকারের নিকট সাহায্যে এগিয়ে আসার দাবী জানিয়ে সমাবেশ করে কোনো লাভ নেই। এই সরকারের (কিংবা জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের) নিকট দাবী জানানোর পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিকট দাবী জানান, যেন তারা এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। আপনাদের আয়োজিত সমাবেশ ও মিছিলগুলো থেকে এই দাবী তুলে আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনাদের দাবী হতে হবে সেনানিবাসগুলোর প্রতি, সরকারের প্রতি নয়। আপনাদের পরিচিত সেনাঅফিসারগণ যারা আপনাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয় কিংবা বন্ধু, তাদের নিকটও এই দাবী পৌঁছে দিতে হবে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করুন যেন তারা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খিলাফত প্রতিষ্ঠাই স্বমূলে এই সমস্যার সমাধান করবে এবং এটাই একমাত্র কার্যকর স্থায়ী সমাধান। নয়তো আগ্রাসনকারীরা বারবার তাদের খেয়ালখুশি মতো আগ্রাসন চালাতে থাকবে আর এখানকার অন্ধ-বধির-বোবা সরকার এসব অসহায়দেরকে হত্যাকারীদের হাতে তুলে দিবে। অতীতে আমরা এমনটাই প্রত্যক্ষ করেছি যেমনটি বর্তমানে করছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা জিহাদ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [সহীহ্ মুসলিম]

খিলাফত রাষ্ট্র হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র যা মুসলিমদের সর্বদা নিরাপত্তা প্রদান করেছে এবং করবে। এই অঞ্চলের ইতিহাসে আপনাদের কাছে রয়েছে তার একটি গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে, সিংহল হতে একদল মুসলিম বণিক যখন ভারত মহাসাগরে সিন্দু উপকূলে নোঙর ফেলে, তখন তাদের জাহাজ লুট করা হয় এবং তাদেরকে আটক করে বন্দী করা হয়। এই খবর যখন খিলাফতের রাজধানীতে পৌঁছায় তখন খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক তার গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যেন তিনি সিন্দের হিন্দু শাসকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় এবং মুসলিমদের মুক্ত করেন। উম্মাহ্'র শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন, তরুন মুসলিম জেনারেল, মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ করা হয়। খলিফার সেনাবাহিনী যখন দিবাল নামক (বর্তমান করাচির নিকটস্থ) স্থানে পৌঁছায়, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের নিকট তার দাবী উপস্থাপন করেন। রাজা তার বিরোধীতা করে এবং মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়, এবং রাজ্য হারায়। এই ঘটনা তখন ফাতেহ্ আল-হিন্দের অর্থাৎ হিন্দ বিজয়ের পটভূমিতে পরিণত হয়। হায়! হাসিনা সরকার আমাদের সেই ইতিহাসের কতই না বিপরীতে অবস্থান

...১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

“আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি – যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না।” সূরা আল-আন’আম : ১২৩]

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নির্বাচন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার খবর সারা বিশ্বে তুমুল হট্টগোল ও কলরবের জন্ম দিয়েছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার পুঁজিবাজারে ব্যাপক ধ্বস নামিয়েছে। এছাড়া, জার্মান চ্যান্সেলর এ্যাঞ্জেলা মার্কেল ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে তার নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে এবং সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে। ফরাসী প্রেসিডেন্টও ট্রাম্পের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতি আপত্তি জানিয়ে এগুলোকে পারস্পরিক অভিন্ন মূলোবোধ বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। অন্যদিকে ইউরোপীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা তার নির্বাচনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য বৈঠকের আয়োজন করে।

আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ট্রাম্পের নির্বাচনের অর্থবহ দিক কি? উত্তরে বলা যায়, নতুন কিছুই না, বরং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরের মোড়ল মার্কিনীদের কর্তৃক চরম বিদ্বেষের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবো। “ডেমোক্রেট” ওবামা কি মুসলিমদের বন্ধু ছিল?! অথবা তার পূর্ববর্তী রিপাবলিকান জুনিয়র বুশ?! হোয়াইট হাউসের ধারাবাহিক প্রেসিডেন্টগুলোর মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু কি কোনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে? বরং তারা প্রত্যেকেই আমাদের ভূমিগুলোর উপর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ চুরি, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, স্বৈরাচারী সরকারগুলোকে সমর্থন এবং নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে।

আফগানিস্তান আক্রমণের মাধ্যমে জর্জ বুশ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা দেয়, এবং মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে সে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইরাক যুদ্ধের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। তারপর ওবামা ক্ষমতায় আসে, এবং ২০০৯ সালে আঙ্কারা ও কায়রো এবং ২০১০ সালে জাকার্তায় মুসলিমদের ধোকা দিতে সুশোভিত বক্তব্য দেয়। এবং তারপর সে তার মুখোশ উন্মোচন করে আশ-শামের গণজাগরণকে দমনে দামেস্কের কসাই খুনি বাশার আল-আসাদকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ড্রোন বিমান ব্যবহারের কারণে জর্জ বুশের সমালোচনা এবং এর বিপক্ষে থাকলেও ক্ষমতায় আসীন হবার পর সে ড্রোন আক্রমণের হার বৃদ্ধি করে; আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে শুরু করে ইরাক, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও সিরিয়া...পর্যন্ত মুসলিম ভূ-খন্ডের প্রতিটি প্রান্তে সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

হ্যাঁ, আমাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী আক্বিদাহ্ (ঈমান)। তাই নিঃসন্দেহে মার্কিন শাসকদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই পরিলক্ষিত হবে না। হোয়াইট হাউসে যেই আসীন হোক না কেন, তা বাহ্যিক চেহারার পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই না; কারণ প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে গৃহিত নীতির ক্ষেত্রে মার্কিনীরা সীমালঙ্ঘন করেই যাবে। কিন্তু, দৃশ্যত শক্তি যাই হোক না কেন, এটা অব্যাহত থাকবে না, সমাপ্তি ঘটবে, নিপীড়িত মানুষের দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে মিথ্যার (বা’তিল) অনিবার্য ধ্বংস ততই ঘনিয়ে আসছে। যখন মুসলিমরা তাদের ঈমান, তাদের রব-এর উপর দৃঢ় থাকবে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে আল্লাহ্’র সন্তুষ্টিকে বেশী গুরুত্ব দিবে, এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা’র শারী’আহ্ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের পক্ষে অবস্থান নিবে। কারণ মুসলিমরাই পারে মার্কিনীদের চাপিয়ে দেয়া দুর্দশা এবং দুঃখ-কষ্ট হতে মানবজাতিকে রক্ষা করতে, এবং মানবজাতিকে কুফরের অন্ধকার হতে ইসলামের আলোয়, পুঁজিবাদী সভ্যতার যুলুম হতে ইসলামের ন্যায়বিচারের ছায়াতলে, এবং এই সংকীর্ণ দুনিয়ার জীবন হতে পরকালের অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে আসতে। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা’র ওয়াদা এবং সত্য ওয়াদা, যা অচিরেই সংঘটিত হবে, ইনশা’আল্লাহ্।

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

ওসমান বাখাশ
হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়ের পরিচালক

১১ সফর, ১৪৩৮ হিজরী
১১ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

জন কেরির ঢাকা সফরের বিশেষ তাৎপর্য: বিশ্বব্যাপী আমেরিকা কর্তৃক পরিচালিত "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" নয়া ক্ষেত্র হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ২৯/০৮/২০১৬, সোমবার, নয় ঘন্টার জন্য বাংলাদেশ সফরে এসে এদেশে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিস্তারের উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে কেরি বলেছে যে, স্থানীয় সশস্ত্র দলগুলোর সাথে 'ইসলামী রাষ্ট্র' সংগঠন (আই.এস.) এর সম্পৃক্ততার বিষয়টি সে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং এ বিষয়ে হাসিনার সাথে তার কোন ধরনের মতবিরোধ হয়নি। সে আরো উল্লেখ করেছে যে, এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ 'অধিকতর মার্কিন উপস্থিতি' প্রত্যক্ষ করবে, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আই.এস.আই.এস.-এর ক্রমবর্ধমান হামলার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে যৌথ অভিযানে সম্পৃক্ত হওয়া।

কেরির বক্তব্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পহেলা জুলাইতে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারীতে হামলা সম্পর্কে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর বক্তব্য সঠিক ছিল। আই.এস.আই.এস.-কে মোকাবেলা করার অজুহাতে বাংলাদেশকে ঘিরে আমেরিকার জঘন্য স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে গুলশান হামলার পরপরই আমরা একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রদান করি। নিশ্চয়ই এখন এটা পরিষ্কার যে, আমেরিকা তার ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি এই অঞ্চলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্'র আশু উত্থানকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ইন্দো-বাংলা অঞ্চলে যুদ্ধের নতুন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুতের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। গুলশান হামলার পরে, জুলাই মাসের ২৭ তারিখে, মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ডের প্রধান অ্যাডমিরাল হ্যারি হ্যারিস টোকিও-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'রিবিল্ড জাপান ইনিশিয়েটিভ ফাউন্ডেশন'-এ প্রদত্ত তার বিশ মিনিটের বক্তব্যে বাংলাদেশে আই.এস.আই.এস. হুমকি বিস্তারের বিষয়ে আলোচনা করেছে। (নেভিটাইমস, আগস্ট ৩, ২০১৬) মার্কিন নেভির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যখন এই অঞ্চলকে মার্কিনীদের সম্ভাব্য 'পঞ্চম যুদ্ধক্ষেত্র' হিসেবে উল্লেখ করে এবং আই.এস.-কে থামানোর জন্য এখানকার মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে মার্কিনীদের সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানায়, তখন তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এবং, দালাল হাসিনা যে ক্ষমতা রক্ষার জন্য তার মার্কিন-ভারত প্রভুদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমনিভাবে কেরি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে "খুবই ঘনিষ্টভাবে" কাজ করার বিষয়ে হাসিনা "খুবই পরিষ্কার" ছিল।

হিযবুত তাহ্‌রীর, এই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে রুখে দেয়ার জন্য সবসময় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে, যাতে করে মার্কিনীদের এই বিদ্বেষপূর্ণ "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও আরেকটি বলির পাঠা হতে না হয়। আমরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রিয় উম্মাহ্'র পাশে থাকবো, যাতে তাদেরকে এই সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগত দালালদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে না হয়। ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি **হিযবুত তাহ্‌রীর** উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে, আপনারা কাফের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি হাসিনার আনুগত্যে সহযোগিতা করবেন না, কারণ তা নিশ্চিতভাবেই জাতির জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি বয়ে আনবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা মেনে চলো তবে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" [সূরা আলি ইমরান : ১৪৯]

২৭ জিলকদ, ১৪৩৭ হিজরী
৩০ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

...২১ পৃষ্ঠার পর থেকে

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ...

পর্যবেক্ষণ ও তাদের বিষয়ে তদন্ত করতেন এবং তাদের সম্পর্কিত সকল সংবাদ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। আয়-ব্যয়ের বিষয়ে তিনি (সাঃ) তাদের জবাবদিহি করতেন। আবু হুমায়িদ আল সা'ঈদী থেকে আল বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে,

"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইবন-উল-উতবিয়াকে বানু সালিম গোত্রে সাদাকা আদায়ের জন্য আমীল নিযুক্ত করেন। যখন তিনি নবী (সাঃ) এর কাছে ফেরত এলেন, তিনি বললেন, "এটি আপনার জন্য এবং এই (উপহার) আমার জন্য।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"তুমি কেন তোমার পিতামাতার গৃহেই থেকে গেলে না যাতে সেখানেই তোমার কাছে উপহার আসে যদি তুমি সত্য বলে থাক।"** (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং: ৬৯৭৯)

উমরও (রা.) খুব নিবিড়ভাবে ওয়ালীদের পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি মুহম্মদ ইবনে মাসলামাকে ওয়ালীদের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। হজ্জের সময় তিনি সব ওয়ালীদের কাজের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য তাদের একত্র করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। এছাড়া, তিনি উলাই'য়াহ্'র বিভিন্ন বিষয় ও তাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতেন। এটা বর্ণিত আছে যে, একবার উমর (রা.) তার আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কি মনে কর, তোমাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম লোকটিকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করলে এবং তাকে ন্যায়পরায়ন হতে বললেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাজের মূল্যায়ন করবো এবং নিশ্চিত হবো যে, আমার আদেশ সঠিকভাবে পালিত হয়েছে।' ওয়ালী এবং আমীলদের কঠোরভাবে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করার জন্য উমর (রা.) প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি

...১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

লিফলেট: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর ছাত্র সদস্যবৃন্দ

হে মুসলিম তরুণ! আপনি কি নিখোঁজ?

১ জুলাই, ২০১৬, গুলশানে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, কারণ আমরা প্রথমবারের মত বাংলাদেশে জিম্মি পরিস্থিতি এবং সেইসাথে বহু দেশী-বিদেশী নাগরিকের নৃশংস হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করলাম। ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের ধ্বংসস্তুপ থেকে সৃষ্ট তথাকথিত "আই.এস.আই.এস" নামধারী সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যরা এই বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে বলে বলা হচ্ছে, যারা গত রমযান মাসেও তুরস্ক ও ইরাকে একাধিক বোমা হামলার মাধ্যমে অসংখ্য শিশুসহ শত শত নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করে। যদিওবা কুর'আনে উল্লেখিত আয়াত হতে এটা সুস্পষ্ট যে ইসলামে এই ধরনের হত্যাকান্ড সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিলাম যে, যদি কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করল সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই হত্যা করল, আর যে কারও জীবনকে রক্ষা করল সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই রক্ষা করল।" [সূরা আল-মা'য়িদাহ্ : ৩২]

বাংলাদেশে এই ধরনের হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটা বিশ্বজুড়ে মুসলিম এবং বিদেশী নাগরিকসহ অমুসলিমদের উপর পরিচালিত ধারাবাহিক আক্রমণগুলোর অংশ মাত্র, এবং যার মধ্যে কিছু হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছে "আই.এস.আই.এস" নামক সংগঠনটি। গুলশানের ঘটনায় যে বিষয়টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল, হামলাকারীদের কয়েকজন বিত্তবান ও প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান যারা ইংরেজী মাধ্যম ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। হামলার পর হতে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো সবার নজরে আছে, প্রায়শই গণমাধ্যম ও তথাকথিত সুশীল সমাজ কর্তৃক এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথাকথিত জঙ্গি তৈরি ও আশ্রয়দাতা হিসেবে দোষারোপ করা হচ্ছে, যা ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সমভাবে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। একদিকে আতঙ্ক হচ্ছে হয়তোবা তাদেরকে এসব কর্মকান্ডে একধরনের সহযোগীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতে পারে এবং অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অতিরিক্ত নজরদারির কবলে পড়তে হবে।

কিছু রাজনীতিবিদ, টকশো'র বক্তা, কলামিস্ট ও ফেইসবুক "তারকারা" এই ভীতিকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনাকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষদাগার করার তাদের নিজস্ব নোংরা এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। তারা এতটুকুও বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে যে, ক্রমবর্ধমান "ধার্মিকতা" মৌলবাদের উত্থানকে নির্দেশ করে, এমন যেন পশ্চিমা মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যান করে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা তরুণদের জন্য অপরাধ।

মিডিয়াতে যথেচ্ছ বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পাওয়া এসব ব্যক্তিরা তথাকথিত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামকে রুখতে বারবার তরুণদের মধ্যে "সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের" (যার দ্বারা তারা মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার) চর্চা বৃদ্ধির কথা বলে আসছে। তারা যে চিত্রটি তুলে ধরতে চায় তা হচ্ছে, রাজনৈতিক ইসলাম প্রকৃতিগতভাবে পশ্চাৎমুখী, বর্বর ও হিংস্র, এবং গুলশান হামলার মত পাশবিকতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে আরও বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করা। কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি এবং এটা পৃথিবীকে কি দিয়েছে?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে "ধর্মীয় সহনশীলতা" নয়, যদিওবা মানুষের মধ্যে এ অর্থই বহুল প্রচলিত; এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ থেকে ধর্মীয় সহনশীলতার উদ্ভবও ঘটেনি। পশ্চিমা বিশ্বে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর মধ্যে সহনশীলতা ও সম্প্রীতির অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে কিন্তু ইসলামী বিশ্বে তা ১৪০০ বছর যাবৎ বিদ্যমান ছিল। আর এই ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমারা উপনিবেশিকতাবাদের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব হতে এই সম্প্রীতি ও সহনশীলতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ: কি ঘৃণ্যভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বৃটিশরা এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার প্রভাব আজও বিদ্যমান। মধ্যযুগে ইউরোপ ছিল একটি অন্ধকার ও অনুন্নত মহাদেশ, এবং তারা খ্রীষ্টধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে দলীয় সংঘর্ষ কিংবা জাতিগত দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল। তৎকালীন সময়ে রাজন্যবর্গের চেয়ে রাজনৈতিকভাবে অধিক শক্তিশালী গির্জাসমূহ তাদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের দমন করতে অকথ্য নির্যাতন চালাত, এমনকি প্রয়োজনে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার মতো পৈশাচিক পন্থা অবলম্বনেও পিছপা হতো না। সমাজের মধ্যে এধরনের অবিচার ও নিপীড়নের প্রেক্ষিতে থমাস হবস্, জন লক-এর মতো দার্শনিকদের উত্থান ঘটে, যারা বলা শুরু করে যে রাষ্ট্রের একটি "সার্বজনীন" সত্ত্বা থাকা উচিত, যা কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত হবে না, অর্থাৎ ধর্মকে অবশ্যই সমাজ এবং জীবন হতে আলাদা হতে হবে।

দার্শনিক ও গির্জার মধ্যকার এই সংগ্রামের ফলাফল হিসেবে তারা একটি "আপোসমূলক সমাধানে" উপনীত হয় যা পৃথক "আধ্যাত্মিক" ও "পার্থিব" কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে গির্জা শুধু ধর্মীয় বিষয়াদির উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। এই চিন্তা আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসনের শিকল হতে স্বাধীনতা প্রদান করে এবং সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়াদিতে "স্বাধীনতা" নামক চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" এবং ব্যক্তি মালিকানা ও পুঁজিবাদের মধ্যে "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা" উদ্ভাসিত হয়।

যদিও এই লিফলেটে "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ" মতবাদের ভ্রান্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার সুযোগ নেই, তথাপি ইতিহাসের পর্যালোচনা হতে এর অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট। প্রথমত, ইউরোপের যাজকতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক চিন্তাটির উদ্ভব ঘটেছিল এবং এটা মুসলিম বিশ্বে প্রয়োগযোগ্য নয়। যেসময়ে ইউরোপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল সেসময়ে খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অগ্রসরতা, উন্নতি ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ব ছিল একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, যা ছিল মূলতঃ ইসলামী চিন্তা-চেতনা, শাসন ও সংস্কৃতি বাস্তবায়নের ফলাফল। তখন মুসলিম বিশ্বে দৃষ্টি-বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য

আবিষ্কারের পাশাপাশি সুবিচার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অখন্ডতাকে নিশ্চিত করা হয়েছিল।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ধর্মনিরপক্ষেতাবাদ মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসনের শিকল থেকে মুক্ত করার দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে এটা শুধুমাত্র "ধর্মীয় যাজকশ্রেণী" হতে "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী শাসকশ্রেণীতে" যালিমের হাত বদল করেছে। সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে মানুষের তৈরি আইনের আনুগত্যে বাধ্য করে বস্তুত মানুষকে শাসকশ্রেণীর দাসে পরিণত করেছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর এই ক্ষুদ্র শ্রেণী তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে জনগণকে শোষণ করে এবং খেয়াল-খুশি মত আইন বানায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনালগ্ন হতে আমরা এই চিত্রই দেখে আসছি এবং এখনও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পতাকাবাহী পশ্চিমা দেশগুলোতেও এটাই দৃশ্যমান, যেখানে ১% বাকি ৯৯% জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ: আমেরিকাতে ৪৫ মিলিয়ন মানুষ (প্রতি সাতজনে একজন) খাবারের জন্য রেশন কার্ডের উপর নির্ভরশীল এবং শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন। অথচ অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট ওবামা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৭০০ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যদিওবা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোই এই সম্পদ অব্যবস্থাপনার জন্য অধিকতর দায়ী। পশ্চিমা দেশগুলোর বাইরে যেসব দেশ ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছে তাদের প্রকৃত চিত্র দিল্লি এবং রিও-ডি-জেনিরোর বস্তিগুলোর মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

পুঁজিবাদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে শুধুমাত্র সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে তা নয়, বরং তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে সমাজকে ভাঙ্গনের দিকে নিয়ে গেছে। তারা সহনশীলতার কথা বলে কিন্তু উদ্বাস্তুদের আশ্রয় প্রদানের পরিবর্তে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তারা বর্ণ সমতাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করেছে, অ-শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হতে এটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যাদেরকে তারা অবাধে গুলি, হত্যা ও কারাগারে নিক্ষেপ করছে। এসব সমাজ জনগণকে তাদের বস্তুগত স্বার্থের পথে অন্তরায় এমন যেকোন কিছুকে ও যেকাউকে পরিত্যাগের শিক্ষা দেয়, হোক সেটা ভারতের কোন অ-ভূমিষ্ট কন্যা শিশু কিংবা আমেরিকার কোন বৃদ্ধ পিতা-মাতা। পশ্চিমা বিশ্ব লিঙ্গ সমতার কথা বলে, কিন্তু গড়ে প্রতিবছর আমেরিকাতে ১২ কিংবা তদুর্ধ ২৮৮,৮২০ জন নারীকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয় (ইউ.এস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের তথ্য অনুযায়ী)। বিগত কয়েক শতাব্দীতে আমরা নজিরবিহীন সহিংসতা দেখেছি, যে সময় হতে পশ্চিমারা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব শুরু করেছে। কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অহিংস সমাজ গঠনের দাবী করে, যখন এর অগ্রদূতেরা ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও কাশ্মিরে গণহারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে? পুরাতন ও নব্য উপনিবেশিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, নব্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ফাঁকা বুলি আওড়ায়, যাতে তারা নৃশংসতা চালিয়ে যেতে পারে।

এটা ছিল পশ্চিমা বিশ্বের চিত্র। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এদেশ জনগণের জন্য বসবাসের অযোগ্য। রাজধানী ঢাকার একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত যেন দুঃস্বপ্নের মত। শাসকশ্রেণী কর্তৃক অবাধ দুর্নীতি ও জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বেকারত্ব যেন এদেশের তরুণদের জন্য অভিশাপের মত। দারিদ্রতা, আর্থিক বৈষম্য, অপরাধ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, নারী নির্যাতন... ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হতে সৃষ্ট এই তিক্ত তালিকা যেন শেষ হবার নয়...

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এমন অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশা পরিণতি সকল সচেতন মানুষকে বিকল্প খোঁজার প্রেরণা যুগিয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে একটি টেকসই ও যুক্তিযুক্ত বিকল্প হিসেবে, কারণ এটি একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবনাদর্শ। পাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান হারে ইসলাম গ্রহণের প্রবনতাই এর বাস্তব প্রমাণ, উদাহরণস্বরূপ: ব্রিটেনে প্রতিবছর ৫,২০০ জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং আমেরিকাতে এই সংখ্যা আনুমানিক ২০,০০০। ইতোমধ্যেই ইউরোপের বৃহৎ শহরগুলোতে অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা বেশী। অপরদিকে, অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে মুসলিম ভূখন্ডগুলোতে ইসলামী শাসনের দাবী সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক ২০১২ সালে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৮২% উত্তরদাতা ইসলামী শাসনের পক্ষে মতামত প্রদান করেছে, ইন্দোনেশিয়াতে এর হার ছিলো ৭১%, পাকিস্তানে ৮৪% এবং মিশরে ৭৩%।

ইসলামের প্রতি ক্রমবর্ধমান এই চাহিদাকে মোকাবেলা করতে পশ্চিমারা তাদের দেশে ও মুসলিম বিশ্বে কিছু নির্মম ও বিদ্বেষপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছে। পশ্চিমা দেশসমূহে জনগণের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের প্রবনতা হ্রাস করতে তারা মিডিয়া ও রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে ইসলাম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। আর মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী শাসনের গণদাবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটিয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমারা এসব সংগঠনের উপস্থিতি সহ্য করে এবং এমনকি গোপনে অর্থায়নও করে। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে তারা এসব করছে, কারণ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পুতুল শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতি বহু তরুণের মোহভঙ্গ হয়েছে, ক্রুদ্ধ তরুণ সমাজ তাদের ক্ষোভ প্রশমনের পথ খুঁজছে। এমতাবস্থায় যেসব তরুণ সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝতে পারলে সুচিন্তিত ইসলামী রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে পারতো, তাদেরকে এসব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর ফাঁদে ফেলা হচ্ছে, যা মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এর পাশাপাশি সরকার ও তার আজ্ঞাবহ বুদ্ধিজীবী, এবং মিডিয়াগুলোকে রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর সুযোগ করে দিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করছে এবং জনগণকে ব্যক্তি ও সামাজিক দুর্দশার সমাধান হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হতে দূরে সরিয়ে রাখছে।

সহিংসতা অবলম্বন কিংবা শোষণমূলক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে গ্রহণ, কোনটাই এখানে সমাধান নয়। সমাজ পরিবর্তনের জন্য ইসলাম নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে সহিংসতাহীন বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বিদ্যমান। ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত চিন্তাগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খন্ডন করে, শাসকদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে এবং ইসলামকে সমাধান হিসেবে উপস্থাপনের মাধ্যমে মক্কার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন, আজকে আমাদেরকেও একইভাবে কাজ করতে হবে। সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) মক্কার অধিবাসীদের আতঙ্কিত করেননি কিংবা সহিংস সশস্ত্র সংগঠন গঠন করেননি। তিনি (সাঃ) সাহাবীদেরকে (রা.) অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করে বলেছেন, **"আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং যুদ্ধ করো না।"** [সীরাতে ইবনে হিশাম]

আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্বের কোন অঞ্চলে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতি হতে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হইনি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সহিংস পন্থা অবলম্বন করে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় এবং এটা ইসলামী শারী'আহ্'রসাথে সাংঘর্ষিক, এমনকি পরিবর্তনের প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

...১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

লিফলেট (অনুবাদকৃত): হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ সিরিয়া

"যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী হন তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৬০]

দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং সংকল্পের গুণে মুজাহিদগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্যায় ও যুলুমের বাহিনীসমূহের বিরুদ্ধে উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে বিজয় অর্জন করেছেন; যদিও কুফরের মোড়ল মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোট, তার দালাল সিরিয়ার যালিম, তার মিত্র রাশিয়ান ফেডারেশন, মুজাহিদগণের অবস্থান এবং সাধারণ জনগণকে লক্ষ্য করে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে গুড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উন্মত্ত বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু সিরিয়ার জনগণের দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্'র জন্য নিজেদের কুরবানী করার আকাঙ্খার সামনে আন্তর্জাতিক যুলুমের সবপ্রক্রিয়া অসহায় হয়ে পড়েছে। গত কয়েকদিনের ঘটনা নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণ করে যে, আমরা মিত্র বাহিনী ও তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কবল থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম, যদি আমরা সঠিকভাবে আল্লাহ্'র উপর ভরসা করতে পারি এবং আমাদের মধ্যে যদি দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প বিদ্যমান থাকে।

আলেপ্পোর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং সেখানকার জনগণের উপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়ার ব্যাপারে উত্তরাঞ্চলের কিছু দলের মতৈক্যের ফলে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠা, যা আল্লাহ্'কে সন্তুষ্ট করে, তার ভিত্তিতে সকল নিষ্ঠাবান দলসমূহের ঐক্য এখন অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি সহজতর। এবং তারা সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তথাকথিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে যুক্ত দলসমূহ ও তাদের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণকারী সব সমর্থকদের সাথে যারা এই ঘৃণ্য শাসককে রক্ষার জন্য বিভিন্ন সীমারেখা আরোপ করেছিল।

অতঃপর দামেস্ক এবং তার পার্শ্বস্থ সাহেল-এ যালিমের কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে সুশৃংখল আক্রমণ পরিচালনার দিকে অগ্রসর হোন যাতে এই অপরাধী শাসকের দ্রুততম সময়ে পতন সংঘটিত হয়। এবং উত্তরের মতো দক্ষিণাঞ্চলেও তার উপর ঐক্যবদ্ধভাবে আঘাত পরিচালনা করুন, যা এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত দলসমূহকে এমন তীব্রস্রোতের আকারে পরিণত করবে যে স্রোত এই পচনধরা পুঁজিবাদের বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলে তথায় ইসলামের মহান বৃক্ষটিকে রোপন করবে, যে বৃক্ষ তার মালিকের অনুমতিক্রমে সবসময় ফল প্রদান করে থাকে।

হে আল-শামের অধিবাসী মুজাহিদগণ :

কুফর এবং যালিম বাহিনীসমূহ আপনাদের উদ্যম এবং নিষ্ঠার সামনে হতাশ হয়ে পড়েছে; সুতরাং, আপনাদের অন্তর্নিহিত উত্তম বিষয়টি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নিকট প্রকাশ করুন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"তোমরা হতাশ হয়ো না, দুঃখ করো না; বিজয় তোমাদের হবেই যদি তোমরা মু'মিন হও।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৩৯]

এখন আপনারা আল-শামের যালিমের সামনে জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছেন। সুতরাং, তা বন্ধ করবেন না। এবং ধৈর্য্য ধারন করুন, কেননা বিজয় হচ্ছে শুধুমাত্র ধৈর্য্যের একটি প্রহর গোনা। আর তেমনটি হয়ে উঠুন যেমনটি আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) তাঁর হাদিসে মুসলিমদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন: **"নিশ্চয়ই বিশ্বাসীরা হচ্ছে একটি প্রাচীরের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে।"** [সহীহ মুসলিম]

সুতরাং সবদিক থেকে আল-শামের যালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন, কারণ আল্লাহ্'র শপথ, সে এবং তার প্রভুরা হক্বের সামনে টিকতে পারবে না – যার সমর্থনে আছেন আসমান ও জমীনের সর্বময় ক্ষমতার মালিক। যালিমদের পায়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দিন এবং আল-শামের বরকতময় বিপ্লবকে আল্লাহ্'র সকল দুশমনের জন্য একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করুন, যা তাদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা ভুলিয়ে দিবে।

ইসলামের প্রাণভূমি আল-শামের অধিবাসী হে মুসলিমগণ :

আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন কিভাবে পশ্চিমারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এবং তারা একদিকে আমাদেরকে আলাপ-আলোচনার পথে চালিত করে আমাদের বিপ্লবের ইসলামী চরিত্রকে ধ্বংসের প্রবল চেষ্টা করছে, এবং শাসক ও তার যুলুমের স্তম্ভ এবং তার সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনীর নির্মম নির্যাতনকে বজায় রাখতে আল-শামের বিপ্লবের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে তারা তাদের দালাল আল-শামের যালিমের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখছে। সুতরাং আপনাদের সন্তানদের পবিত্র রক্তকে নিয়ে কাউকে নোংরা দর কষাকষিতে লিপ্ত হতে দিবেন না। যারা বিভিন্ন অজুহাতে শিশু হত্যাকারী এবং আমাদের মর্যাদা লুণ্ঠনকারীর সাথে হাত মেলাতে চায়, এমন প্রতিটি হাতকে কেটে ফেলুন। স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করুন যে, আমরা সমঝোতা করবো না, হার মানবো না এবং নমনীয় হবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্'র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্'র সুসংবাদ সত্যে পরিণত হয়। যা হচ্ছে এই যুলুমের শাসনের অবসান, নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহ্'র হুকুমের বাস্তবায়ন করা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র উপর ভরসা করুন, আপনাদের নিজ হাতেই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর ভরসা করবেন না, করলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল, যার পরিণতি অপমান এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই না। সুতরাং এই গণজাগরণকে সেভাবেই এগিয়ে নিন যেভাবে তার শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ "আল্লাহ্'র জন্য"; এবং আল্লাহ্'র রাসূল ছাড়া কাউকে এর নেতা হিসেবে মেনে নিবেন না অথবা আল্লাহ্'র বিধান ব্যতিত অন্য যেকোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করুন। কুফর শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে যতই চেষ্টা চালিয়ে যাক না কেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মাহ্'কে কখনোই মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত করার এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতার উত্তরাধিকারী করার।" [সূরা আল-কাসাস : ৫]

০৩ জিলক্বদ, ১৪৩৭ হিজরী
০৬ আগষ্ট, ২০১৬ খৃস্টাব্দ

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

হে মুসলিম সেনাবাহিনী! আলেপ্পোর শিশুদের অনাহার এবং হত্যাকান্ডও কি তোমাদের জন্য তাদের রক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়?!!!

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পূর্ব আলেপ্পোর মুসলিমগণ খুনী আসাদ এবং রাশিয়ান বাহিনীর নিষ্ঠুরতম অবরোধের শিকার হয়ে আসছেন। ৩,০০,০০০ সাধারণ নাগরিক, যার মধ্যে ৬০ ভাগই নারী ও শিশু, শহরটিতে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং খাবার, পানি এবং ঔষধ সরবরাহ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী খাবারের মজুদ আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ টিকবে, তারপর শহরটি গণঅপুষ্টি এবং অনাহারের কবলে পড়বে, যেমনটি ঘটেছে মাদায়া ও অন্যান্য শহরে, যে শহরগুলো সিরিয়ার কসাই ঘৃণ্য শাসক দ্বারা অবরুদ্ধ। আলেপ্পোর একজন ত্রাণকর্মীর বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে যে, অবরোধ পরবর্তী খাবার সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ৫ টি রুটি দিয়ে ১০ জনের একটি পরিবার ২ দিন অতিবাহিত করছে। এর পাশাপাশি সিরিয়া ও রাশিয়ার বর্বর বাহিনী নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে নারী-শিশু নির্বিশেষে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এর জনগোষ্ঠী ও কাঠামোকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব আলেপ্পোর ৪টি হাসপাতাল এবং একটি ব্লাড ব্যাংক গত ২৩ ও ২৪ জুলাই কয়েকদফা বিমান হামলার শিকার হয়। কিছুদিন পূর্বে শহরের একমাত্র শিশু হাসপাতাল ১২ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে দুইদফা বিমান হামলার শিকার হয়। এবং ২৯ জুলাই একটি প্রসূতি হাসপাতাল হামলার শিকার হয়েছে যাতে বেশকিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

আলেপ্পোর সম্মানিত নারী এবং নিরাপরাধ শিশুদের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা – হয় শহরে অবস্থান করে গণহত্যা কিংবা অনাহারের শিকার হয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করা, না হয় শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টাকালে আসাদ বাহিনীর বুলেটের মুখে পড়া। এমন ভীতিকর অবস্থার মধ্যেও আমাদের সাহসী মুসলিম বোনেরা ঘৃণ্য আসাদ সরকারের বুলেট-বোমাকে উপেক্ষা করে মুজাহিদগণের সমর্থনে রাজপথে নেমে এসেছে, বিভিন্ন শ্লোগাণ সম্বলিত ব্যানার তুলে ধরেছে, "আলেপ্পো যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা উম্মাহ্'র লড়াই"; উম্মাহ্'কে রক্ষা করার তীব্র আকাঙ্খা তাদেরকে রাজপথে নিয়ে এসেছে, কারণ কোনো মুসলিম সেনাবাহিনী এই দায়িত্ব পালন করছে না! আলেপ্পোর শিশুরা নির্ভীকভাবে টায়ার জ্বালিয়ে ধোয়া সৃষ্টি করে শত্রুর বোমা হামলাকে নস্যাতের চেষ্টা চালাচ্ছে, কারণ যাদের উপর তাদেরকে রক্ষার দায়িত্ব ছিল তারা ব্যারাক বসে আছে!

সুতরাং, আমরা মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতিটি কমান্ডার, প্রতিটি জেনারেল এবং প্রতিটি সৈনিকের নিকট এই প্রশ্ন রাখতে চাই – আলেপ্পোর অসহায় শিশুরা যখন অনাহার আর গণহত্যার মুখোমুখি তখন আপনারা কোথায়? কেন আপনারা তাদেরকে তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন? আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে যখন উম্মাহ্'কে রক্ষায় অবুঝ শিশুরা এগিয়ে আসে, তখন কিভাবে আপনারা তা প্রত্যক্ষ করেন? অথচ, এই দায়িত্ব আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে আপনাদের উপর অর্পিত, যে ব্যাপারে আপনারা পরকালে নিশ্চিতভাবে জিজ্ঞাসিত হবেন। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনারা আল-শামের পূণ্যভূমিকে আপনাদের ভাই-বোনদের লাশের স্তুপ দ্বারা গণহত্যার মঞ্চে পরিণত হওয়াকে প্রত্যক্ষ করছেন, অথচ তাদেরকে রক্ষায় এগিয়ে আসেননি। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে আপনারা আপনাদের বোনদের আহাজারি শুনছেন, যারা তাদের সন্তান ও পরিজনের লাশের সামনে মাতম করছে, যারা আসাদের কুকুর বাহিনীর লাঞ্ছনা কিংবা নৃসংশ হত্যাকান্ডের শিকার, অথচ তাদের রক্ষার আহ্বানে সাড়া প্রদান করেননি। এবং পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে আপনারা বিমান হামলায় সিরিয়ার শিশুদের জীবিত সমাধিস্থ হতে দেখছেন কিংবা তাদেরকে কুকুর-বিড়ালের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতে দেখছেন, অথচ তাদের দুঃসহ অবস্থার অবসানের জন্য কিছু করেননি। এই দায়িত্ব পালনে বিশাল অবহেলার ব্যাপারে কিভাবে আপনারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আপনাদের রব (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর কাছে জবাবদিহী করবেন? আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, অনতিবিলম্বে আপনাদের ভাইবোনদের আর্তনাদে সাড়া দিন, যেন আপনারা দুনিয়ার জীবনে সম্মান, আপনাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন এবং উম্মাহ্'র রক্ষাকারী হিসাবে আখিরাতে মহান পুরস্কারে ভূষিত হতে পারেন। এবং আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি, অবিলম্বে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন, যে রাষ্ট্র বিশ্বের সকল অরক্ষিত মুসলিমকে রক্ষা ও দ্বীনের তত্ত্বাবধানে নির্দ্বিধায় সেনাবাহিনী পরিচালিত করবে, যেন আপনারা আপনাদের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন।

"আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্'র রাস্তায় লড়াই করছো না! অথচ দুর্বল নারী, পুরুষ, শিশুরা আকুতি করে বলছে: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে মুক্তি দিন, যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" [সূরা আন-নিসা :৭৫]

ড. নাজরীন নেওয়াজ
হিযবুত তাহ্‌রীর-*এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কর্যালয়ের মহিলা শাখার পরিচালক*

৪ জ্বিলক্বদ, ১৪৩৭ হিজরী
৭ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়

“আর তুমি কখনও মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বেখবর। তবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।” [সূরা ইব্রাহীম: ৪২]

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্ মহান! আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নিকট কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। অবশেষে সেইদিনটির আগমন ঘটলো যেদিনটিতে আমরা যালিম একনায়ক কারিমভ-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলাম। সিকি শতাব্দী ধরে যার নিষ্ঠুর শাসনের অধীনে উজবেকিস্তানের জনগণ, বিশেষতঃ **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতা-কর্মীরা নানাবিধ যুলুম ও নির্যাতন, স্বৈরশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়েছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতা-কর্মীদের অনড় অবস্থান পরীক্ষার চেষ্টায় এই ঘৃণ্য নীচ যালিম শাসক সংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার ও তার ভয়ঙ্কর কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেখানে না আছে নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আর না আছে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার জন্য বিশুদ্ধ বাতাস, কেননা এই কারাগারগুলো হয় দেশের এমন প্রান্তে অবস্থিত যেখানে রয়েছে তীব্র শীত অথবা এমন মরুভূমিতে যেখানে রয়েছে তীব্র তাপদাহ। কারিমভের ইসলাম বিদ্বেষ এবং মুসলিমদের প্রতি তার দুষ্কর্মের কারণে হাজার হাজার সন্তান আজ এতিম, হাজার হাজার স্ত্রী আজ বিধবা এবং হাজার হাজার মা সন্তান থেকে বঞ্চিত।

হ্যাঁ, এই একনায়ক এখন জমীনের নীচে! কিন্তু বৃহৎ আনন্দে উল্লোসিত হওয়ার সময় এখনও আসেনি। কারণ আমরা উজবেকিস্তানের ভবিষ্যৎ এবং সেখানকার জনগণের জন্য অনাগত দিনে কি অপেক্ষা করছে তা ভেবে উদ্বিগ্ন। যাই হোক না কেন আমরা অবগত আছি যে কারিমভ প্রকৃতপক্ষে ছিল নিপীড়নের বিশাল চাকার একটি চালক মাত্র। এই চালক ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু এই চাকায় স্থান নেয়ার জন্য আরেকজনের পালা আসবে, যে কারিমভের মতই ঘৃণ্য কিংবা তারচেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। মিশরের উদাহরণ এক্ষেত্রে সবার জন্য দৃষ্টান্ত। হ্যাঁ, মোবারক ছিল একজন যালিম, কিন্তু সিসি তার চেয়েও নির্মম ও নৃশংস।

যখন উজবেকিস্তানের জনগণের মধ্য হতে হাজারো মুসলিম কারাগারে ধুঁকছে, যখন লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে কাজের সন্ধানে কিংবা যালিমের নিপীড়ন হতে বাঁচতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং পরে আর ফিরে আসতে পারেনি, তখন পূর্বের শাসনব্যবস্থার কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, তেমনি রয়ে গেছে।

হে উজবেকিস্তানের মুসলিমগণ! কারিমভের মৃত্যু আবারও প্রমাণ করলো যে, প্রত্যেক যালিমেরই শেষ আছে! কোন যালিমই চিরকাল বেঁচে থাকবে না, এবং তাদের ক্ষমতাও চিরস্থায়ী হবে না! তাদের রাজত্ব শাশ্বত নয়। সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তব রূপ নেবে। “....**এবং অতঃপর আসবে যুলুমের শাসন, এবং তা ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চান। তারপর, আবারও আসবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত।**” [আবু দাউদ, আহ্‌মাদ]

হে উজবেকিস্তানের মুসলিমগণ! নবুয়্যতের আদলে সত্যনিষ্ঠ খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও বুলি আওড়ে কেউ যাতে আপনাদের বোকা বানাতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। অতীতের মতো আর ধোঁকায় পড়বেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিমদের বিচক্ষণ ও সতর্ক হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “**মুমিন কখনও একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না।**” [বুখারী]

৩ জিলহজ্জ, ১৪৩৭ হিজরী
৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

...০৬ পৃষ্ঠার পর থেকে

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ...

শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অকাট্য দলিল-প্রমাণ ছাড়াই তাদের মধ্যে অনেককে অপসারণ করেছেন এবং কিছু ওয়ালীকে সামান্যতম সংশয়ের কারণে অপসারণ করেছেন, যা কিনা সন্দেহের পর্যায়েও পরে না। তাঁকে এ সম্পর্কে একদা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, “জনগণের বিষয়াবলী দেখাশোনার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য একজন আমীরের পরিবর্তে আরেকজনকে স্থলাভিষিক্ত করা সহজ।”

তবে, কঠোরতা সত্ত্বেও তিনি তাদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন ও শাসক হিসেবে সুনাম অর্জনের জন্যও মনোযোগ দিতেন। তিনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাদের যুক্তিসমূহ বিবেচনায় নিতেন। যদি কোনো যুক্তি তার পছন্দ হতো তাহলে তার স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে এবং আমীলদের প্রশংসার জোয়ারে ভাসাতে তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন। একদা হোমসের আমী'ল উমায়ের ইবনু সা'দ সম্পর্কে উমরের কাছে খবর আসলো যে, মিম্বারে দন্ডায়মান থাকা অবস্থায় তিনি বলেছেন, “ইসলাম ততদিন অক্ষয় থাকবে যতদিন এর শাসন কর্তৃত্ব শক্তিশালী থাকবে। তবে, কর্তৃত্বের শক্তি তলোয়ারের আঘাতে হত্যা কিংবা চাবুকের ঘা দিয়ে আসে না, বরং তা সত্য দিয়ে শাসন ও ন্যায়পরায়ণতাকে সুউচ্চে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আসে।” এ কথা শোনার পর উমর (রা.) বললেন, ‘মুসলিমদের তত্ত্বাবধানের জন্য উমায়ের ইবনে সা'দ এর মতো আরও মানুষ যদি আমার থাকতো।

(চলবে...)

■

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ লেবানন-এর পক্ষ থেকে বৈরুতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস বরাবর চিঠি হস্তান্তর

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ লেবানন, বৈরুতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস বরাবর চিঠি হস্তান্তর করে, যেখানে রাহেল-নেওয়াজ সরকারের নিকট হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান-এর একনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী ড. ইফতেখারকে অবিলম্বে মুক্তির দাবী জানানো হয়। এবং পাশাপাশি অপারেশনের পর রাহেল-নেওয়াজ সরকার কর্তৃক চিকিৎসা বঞ্চিত হওয়ায় ড. ইফতেখার-এর জীবন যে কতটা হুমকির সম্মুখীন তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়।

দূতাবাসে প্রেরিত চিঠিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ ছিল: "প্রেস বিজ্ঞপ্তি (অনুবাদকৃত)

ড. ইফতেখারের অবিলম্বে মুক্তি চাই : অপারেশনের পর স্বাভাবিক চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় রাহিল-নেওয়াজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকায় ড. ইফতেখার-এর জীবন এখন হুমকির সম্মুখীন

পাকিস্তানে খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ড. ইফতেখারের বিরুদ্ধে সরকার যে অবস্থান নিয়েছে তা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং আগ্রাসী আচরণের বহিঃপ্রকাশ। ড. ইফতেখার আলসারেটিব কোলাইটিস রোগে ভুগছিলেন যা কারাগারে থাকা অবস্থায় তীব্র আকার ধারণ করে। তার অপারেশনের দাবীতে মাসব্যাপী পরিচালিত কর্মসূচির পর অবশেষে গত ৬ আগস্ট ২০১৬ ইং, দীর্ঘ অপারেশনের মাধ্যমে তার শরীর থেকে একটি বৃহদন্ত্র অপসারণ করা হয়। তিনি যখন পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে অচেতন অবস্থায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন সরকারের নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত বাহিনী ব্যতিব্যস্ত হয় তার পায়ে শিকল লাগানোর কাজে। অপারেশনের পর প্রথমদিকে রক্তক্ষরণ এবং পরবর্তীতে ক্ষতস্থানে ইনফেকশনের কারণে ড. ইফতেখারের অবস্থা যখন অত্যন্ত সংকটাপন্ন তখন কারা কর্তৃপক্ষ তাকে হাসপাতাল থেকে পুনরায় কারাগারে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ প্রদান করে, যদিও সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, অপারেশনের পর তাকে অবশ্যই তিন সপ্তাহ পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ারে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখার ব্যাপারে জোরারোপ করেছিলেন। গত ১১ আগস্ট, ২০১৬, তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে আসা ডাক্তারের উপরও পুলিশ চড়াও হয়। ইন্সপেক্টর জেনারেল পদধারী সরকারের একজন উচ্চপদস্থ গুণ্ডা তাকে জোরপূর্বক কারাগারের মেডিকেল ওয়ার্ডে স্থানান্তর করে, যদিও তিনি একজন অপারেশনের রোগী। বেঁচে থাকার জন্য ড. ইফতেখার-এর আলট্রাসাউন্ড স্কেন, হোয়াইট ব্লাড কাউন্ট, হিমোগ্লোবিনের অনুপাত, ব্লাড কালচার এবং ওয়ান্ড কালচার সহ নানাবিধ চিকিৎসা প্রক্রিয়া আবশ্যক, অথচ সরকারের এই দুর্বৃত্ত গুণ্ডাবাহিনী ড. ইফতেখারকে এই ধরনের কোন চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। সুতরাং, তার উপর আপতিত সকল ধরনের ক্ষতি এবং তার সংকটাপন্ন জীবন যা হুমকির সম্মুখীন তার দায় এই সরকারকে নিতে হবে।

আমরা সকল অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতিসম্পন্ন সাংবাদিক, বিচারক, উকিল এবং মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি বলতে চাই, আপনারা আর কতদিন খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি সরকারের এই ধরনের অমানবিক আচরণের বিষয়ে নীরব থাকবেন?! বিচারকদের কি উচিত না ইসলাম দ্বারা বিচার করা এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত সেইসব রাজনৈতিক কর্মীদের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করা যারা অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা দীর্ঘদিন অত্যাচার নিপীড়নের শিকার হচ্ছে? এক সময় ইসলামের নাম নিয়ে যে ভূমি সৃষ্টি হয়েছিল সেই ভূমিতে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত মুসলিমরা যে অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হচ্ছে মিডিয়ার কি উচিত না তার প্রতিবাদ করা? চিন্তা ও অনুভূতিসম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তির উচিত সেইদিকে অবস্থান নেয়া ও শিক্ষা লাভ করা যা সত্য, এবং যালিমকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া যে, আপনারা মু'মিনদের সাথে তাদের এহেন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।"** [সূরা বুরুজ : ৮]

পরিশেষে, আমরা যালিম সরকার এবং তার সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র, তার শাসকগোষ্ঠী ও দুর্বৃত্ত গুণ্ডাবাহিনী যারা নিজেদেরকে নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে দাবী করে অথচ ইসলাম ও ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি বিদ্বেষী, এবং যালিম সরকারের সাথে আঁতাতকারী কিছু বিচারকবৃন্দ এবং যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র অনুগত বান্দাদের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত তাদের সবাইকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, ড. ইফতেখারসহ **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সকল রাজনৈতিক কর্মীরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র নামে শপথ নিয়েছে যে, তারা নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উম্মাহ্'র পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে এই দ্বীনের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং জেনে রাখ, হে শাসকগোষ্ঠী, নিরাপত্তা বাহিনী ও বিচার বিভাগে কর্মরত অপরাধীরা, তোমাদের এহেন ঘৃণ্য অবস্থান না ড. ইফতেখারের মনোবল ভাঙ্গতে, না খিলাফতের রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্তিমিত করতে সমর্থ হবে, কারণ তোমরা এমন লোকদের মোকাবেলা করছো যারা শহীদ হওয়ার ও জান্নাতুল ফিরদাউস প্রাপ্তির আকাঙ্খা অন্তরে পোষণ করে। এবং খিলাফত রাষ্ট্র যেদিন তোমাদেরকে পাকড়াও করবে এবং উম্মাহ্ প্রতিশোধ নিবে তার সন্তানদের উপর তোমাদের কৃত সকল অপকর্মের জন্য, সেইদিন তোমাদের পালানোর কোনো জায়গা থাকবে না, এমনকি তোমাদের তীর্থস্থান হোয়াইট হাউসের করিডোরেও তোমাদের আশ্রয় হবে না, যা শীঘ্রই সংঘটিত হবে, ইনশা'আল্লাহ্। তাই অন্তত আসন্ন নিয়তি কিছুটা হালকা করতে চাইলে অতিসত্বর ড. ইফতেখারকে মুক্তি দাও নতুবা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যা তোমরা ভুলে গেছো যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

"নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।" [সূরা আশ-শোআরা : ২২৭]

মিডিয়া কার্যালয়, **হিযবুত তাহ্‌রীর**, *উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান" (সমাপ্ত)*

৬ জিলহজ্জ, ১৪৩৭ হিজরী
৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: মিডিয়া কার্যালয়, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ পাকিস্তান

ইহুদী রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন করুন: ইসরাইলী বিমান বাহিনীর সামনে পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা প্রদর্শন করা প্রকাশ্যবিশ্বাসঘাতকতার শামিল

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্ পাকিস্তান, রাহিল-নেওয়াজ সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে, কারণ তারা আমাদের বিমান বাহিনীর দক্ষ বৈমানিকদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'রেড ফ্ল্যাগ ১৬-৪' নামক যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করেছে। মার্কিন বিমান বাহিনীর সংবাদ সংস্থা (AFNS) কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী এই মহড়ায় ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলও অংশগ্রহণ করেছে। এই যৌথ মহড়ার মাধ্যমে ইহুদী হানাদাররা আমাদের সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে স্পর্শকাতর ও গোপন তথ্যাবলী সরেজমিনে হাসিলের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছে। ইসরাইল হচ্ছে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত এমন একটি শত্রু রাষ্ট্র যেটি মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহ জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে এবং আমাদের প্রথম কিব্‌লা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর রাত্রি ভ্রমনের (ইসরা) রহমতপূর্ণ গন্তব্যস্থল আল-আক্‌সা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। এই ইহুদী রাষ্ট্রটি পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যমে অব্যাহতভাবে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং এর পাশাপাশি একের পর এক যুদ্ধ মঞ্চস্থ করে মুসলিম দেশগুলোর দালাল শাসকদের সহায়তায়, পরাজয় বরণের পূর্বনির্ধারিত ফলাফল নিশ্চিতের মাধ্যমে ইসরাইলের অপরাজেয় ভাবমুর্তির বিভ্রম তৈরী করেছে। সুতরাং, ক্রোধান্বিতভাবে এই সংবাদ প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি, কিংবা দালাল শাসকদের এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে ত্বরিত সাফাই প্রদানকারীদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই: কিভাবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যুদ্ধ ব্যতিরেকে প্রকাশ্য শত্রু রাষ্ট্রের সামনে তার সামরিক সক্ষমতাকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে? কিভাবে এধরনের স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তাদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়াতে পারে? যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত মুসলিমদের সাহায্য করার আদেশ প্রদান করেছেন: **"আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।"** [সূরা আল-আনফাল : ৭২], 'আদেশ হচ্ছে আদেশ'-এই যুক্তিতে কিভাবে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা যেতে পারে? যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র আনুগত্যের বাইরে গিয়ে বান্দার কোনো আনুগত্য নাই"** (আহ্‌মাদ ও তাবারানি কর্তৃক বর্ণিত)। এবং, একজন সচেতন মুসলিম কিভাবে খোঁড়া অজুহাতের ভিত্তিতে ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে এধরনের ঘৃণ্য সৌহার্দপূর্ণ সহযোগীতাকে সমর্থন করতে পারে? যেখানে সকলেই জানে যে, ইহুদী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যই যৌথ মহড়ার মতো এসব কর্মকান্ডকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিওবা এখন পর্যন্ত পাকিস্তান এই অবৈধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়নি, বিশেষ করে এমন একটা সময়ে এটা করা হলো যখন ইহুদী যালিমরা বিস্ফোরিত ও ভীত দৃষ্টিতে এই অঞ্চলে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণ প্রত্যক্ষ করছে।

হে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ!

এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ ও বিতর্কের অবকাশ নেই যে, নওয়াজ শরীফ ও রাহিল শরীফের নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ উম্মাহ্'র পাশে না দাঁড়িয়ে তার শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। সুতরাং, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় সমর্থন জানানো, কিংবা তাদের আনুগত্য করা গুরুতর গুনাহ্'র কাজ। আপনারা শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণের রুখে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় রয়েছেন – এই অজুহাত শেষ বিচারের দিনে কোন কাজে আসবে না, কারণ নবুয়্যতের আদলে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করা আপনাদের কর্তব্য। আর, কেবলমাত্র আপনাদেরই রয়েছে সেই শক্তি ও যুদ্ধ করার সামর্থ্য, জনগণের নয়।

সুতরাং, আপনাদের মধ্যে কি একজন মুসাব ইবনে উমায়ের, আসাদ বিন যুরারাহ্, উসাইদ বিন হুযায়ের ও সা'দ বিন মু'আয (রা.) নেই, যিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্'কে (সাঃ) সহযোগীতার মাধ্যমে এই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে চান? যেভাবে সা'দ বিন মু'আয-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আরশ কেঁপে উঠেছিল, কারণ তিনি (রা.) দ্বীনকে বিজয়ী করেছিলেন। আল-বুখারী যাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি (যাবির) রাসূলুল্লাহ্'কে (সা.) বলতে শুনেছি: **"সা'দ ইবনে মু'আয-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্'র আরশ কেঁপে উঠেছিল।"** আপনাদের মধ্যে এমন একজন সামর্থ্যবান ব্যক্তিও কি নেই যিনি সাহসী ও পৌরুষদীপ্ত বীর সাহাবাদের (রা.) উত্তরাধিকারী হিসেবে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং এমন একজন খলিফাকে নিয়োগ দিতে পারেন যিনি আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে নিবৃত্ত করবেন না, বরং আপনাদেরকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিবেন। কারণ, ইমাম হচ্ছেন তিনি যার অধীনে মুসলিমরা লড়াই করে। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: **"নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল, যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।"** এবং, তার নেতৃত্বে ইহুদী রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে ও ইসলামের পবিত্র ভূমিসমূহ মুক্ত করা হবে। এবং, খলিফা পুনরায় উমর আল-ফারুক (রা.)-এর সময়কার গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরিয়ে আনবেন, যিনি আল-কুদ্‌স ও তার চারপাশের ভূ-খন্ডসমূহ মুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন; সালাহ্‌উদ্দীন আইয়্যুবির বীরোচিত পদক্ষেপের প্রত্যার্পন করবেন, যিনি ক্রুসেডারদের কাছ থেকে আল-কুদ্‌সকে মুক্ত করেছিলেন; এবং, খলিফা আব্দুল হামিদ (দ্বিতীয়)-এর বলিষ্ঠ কণ্ঠকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি আল-কুদ্‌সকে রক্ষা করেছিলেন এবং তার কাছে নিজের জীবন ও সম্পদ থেকেও সেটি অধিক মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

৪ জিলহজ্জ, ১৪৩৭ হিজরী
৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেসবিজ্ঞপ্তি: মিডিয়া কার্যালয়, হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ তুরষ্ক

আমরা এক উম্মাহ্ এবং এক হৃদয়

সাম্প্রতিক সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র উম্মাহ্'র নিকট উন্মোচনের লক্ষ্যে এবং এর প্রতিবাদে **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ তুরষ্ক – ইস্তাম্বুল, বুরসা, আঙ্কারা, মারসিন এবং সানিলুরপাতে পবিত্র জুমা'বারে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির আয়োজন করে। ভেন, ইলাজিগ, দিয়ারবাকির, গাজিয়ানটেপ, হালেপ, গাজা এবং সর্বশেষ সিজরি শহরে যারা সন্ত্রাসী হামলায় যারা নিহত হয়েছেন তাদের গায়েবানা জানাযা নামাযের পর প্রেস বিবৃতির অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে উম্মাহ্'র সামনে যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল:

তুরষ্কসহ সারা বিশ্বে এই ধরনের ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলা ও গণহত্যার জন্য যারা প্রকৃতপক্ষে দায়ী তারা হচ্ছে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ সামগ্রিক এই সন্ত্রাসী হামলার উস্কানিদাতা। এর কারণ, এমন কোনো গণহত্যা এবং অপরাধ নেই যা তারা তাদের স্বার্থের জন্য করেনি কিংবা করবে না। উসমানি খিলাফত ধ্বংস হওয়ার পর পুরো বিশ্ব এইসব কুফর রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। প্রকৃতপক্ষে, তখন থেকে পুরো বিশ্ব এক রক্তের সমুদ্রে পরিণত হয়। এইসব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যারা ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতায় লিপ্ত থাকার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় মত্ত তারা তাদের দালালদের কর্তৃক সংঘটিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আগ্রাসন এবং হামলাকে সমর্থন করেছে। ১৫ জুলাই রাতসহ বছরের পর বছর জুড়ে যেসব হামলা সংঘটিত হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে এসব সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃত রাজনীতি আড়াল করে এবং এই রাজনৈতিক সংকট মুহূর্তে কেন আমরা এখনো আমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যাচ্ছি? কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি এই ধরনের হত্যাকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে?! এখনো সময় আছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র বক্তব্য হতে শিক্ষা লাভ করুন: **"ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।"** [সূরা আল-বাকারা : ১২০]

হে মুসলিমগণ! এমন একটি দিনও অতিবাহিত হচ্ছেনা যেখানে আপনারা নতুন কোনো "সন্ত্রাসী" হামলার শিকার হচ্ছেন না? আপনারা কি বলবেন আর কতকাল আপনারা এসব নৃসংশ হামলা সহ্য করবেন? বলুন, আর কতকাল জ্বলন্ত কয়লায় পুড়ে অঙ্গার হবেন? আর কত নিষ্পাপ শিশুকে নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হবে? কে এসব বেপরোয়া উন্মত্ত সন্ত্রাসী রাষ্ট্রসমূহ, এসব পাথুরে হৃদয় সম্পন্ন কসাইদের, মানবিক মূল্যবোধহীন তথাকথিত বন্ধুদের রুখে দাঁড়াবে, আপনারা কি তা বলতে পারেন? কে এসব গণহত্যা এবং সন্ত্রাসী হামলার পরিসমাপ্তি ঘটাবে? আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) ওয়াস্তে কে মুসলিমদের নির্যাতন ও হত্যার হাত থেকে বাঁচাবে, বলুন?

এরা কি তারা, যারা ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদিদের সাথে চুক্তি করাকে অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করে? এরা কি তারা, যারা বলে যে এই অঞ্চলে আমাদের জন্য 'ইসরাইল' রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে, যে ইসরাইল মাত্র ৫ দিন আগেও গাজায় বোমাবর্ষণ করেছে এবং আল-আক্সাকে দখল করে রেখেছে, যা মুসলিমদের তিনটি পবিত্র স্থানের একটি? তারা কারা, যারা এই হানাদার ইহুদিদের বিশ্বাস করে, যারা এমনকি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল?

কিংবা তারা কারা, যারা সিরিয়ার কসাই যালিম আসাদের সাথে শান্তিচুক্তি করতে চায়, যে কিনা ৫০ হাজারেরও অধিক মুসলিমদের হত্যা করেছে, যার সাব্বিহা বাহিনী হাজার হাজার বোনদের সম্ভ্রমহানী করেছে, ১ লাখেরও অধিক শিশুকে হত্যা করেছে?? এরাই কি তারা যারা খুনী আসাদের রক্তাক্ত হাতের সাথে হাত মেলাতে ব্যাকুল?

কিংবা এরাই কি তারা, যারা তথাকথিত সন্ত্রাসের সাবকন্ট্রাক্টারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অথচ তার মদদদাতা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একটা বাক্যও উচ্চারণ করে না? এরা কি সেই কাপুরুষরা যারা শিখিয়ে দেওয়া বুলির মতো চিৎকার করে বলে এই ঘটনার পিছনে মাস্টার মাইন্ডরা জড়িত কিন্তু তারা এটা বলতে এতটা ভয় পায় যে, কোন রাষ্ট্র বা কোন মাস্টার মাইন্ড এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?

হে মুসলিমগণ! আপনাদেরকে হত্যার সময় সাম্রাজ্যবাদীদের হাত কাঁপে না! আপনাদের উপর বোমাবর্ষণের সময় ইহুদিরা দ্বিধান্বিত হয় না! সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সময় 'সন্ত্রাসীরা' ভয়হীন থাকে! অথচ আপনাদের শাসকেরা সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে ভীত থাকে! কিন্তু আল্লাহ্ আয ওয়া যাল কি এই পৃথিবীতে সবচাইতে অধিক ভয়ের যোগ্য নয়? এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে সাম্রাজ্যবাদীরা জড়িত, এই সত্য জানা সত্ত্বেও যেসব শাসকেরা তাদের সঙ্গে এখনও বন্ধুত্ব স্থাপন করে চলেছে এবং মুসলিম ভূমিতে সন্ত্রাসীদের দূতদের থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের রব আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন: **"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ যালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।"** [সূরা মা'য়িদা : ৫২]

হে উম্মাহ্'র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ! এখনও কি আপনারা এসব কাফিরদের সহায়তা আশা করছেন যাদেরকে আল্লাহ্ আয ওয়া যাল শত্রু হিসেবে প্রকাশ করে দিয়েছেন? আপনারা কীভাবে এইসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে হাত মেলান? এবং আপনারা কীভাবে এই হত্যাকারীদেরকে রাজপ্রাসাদে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ

জানান? কীভাবে এখন আপনারা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করছেন, যা আপনারা যালিম আসাদের বিরুদ্ধে পারেননি, যে কিনা মার্কিনীদের নির্দেশে যুবক ও বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ এবং শিশু নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের হত্যা করেছে, গণহত্যা চালিয়েছে?

হে শাসকবৃন্দ! নিশ্চয়ই মর্যাদা ও শক্তির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সুতরাং, শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করুন! মার্কিনীদের সন্তুষ্ট করার অর্থ হচ্ছে মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা, কারণ পুরো বিশ্বই জানে যে এই খুনী মার্কিনীরা কীভাবে মুসলিমদের ঘৃণা করে। সুতরাং, এই ধরনের বিশ্বাসঘাতক কর্ম এবং এই ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন! ইসলাম ও শারী'আহ্ আইনকে মেনে চলুন। আল্লাহ্'র কসম, এটা আপনাদের জন্য ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ বয়ে আনবে।

হে মুসলিমগণ! আমরা এমন একটি স্বতন্ত্র জাতি, যারা একই আল্লাহ্'তে বিশ্বাস করি, তাঁকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছি, এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমরা হচ্ছি সেই সর্বোত্তম জাতি যারা মানবজাতিকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করি। আমরা হচ্ছি সেই গৌরবান্বিত উম্মাহ্ যারা কাফিরদের বিরুদ্ধে দারদানেলস এবং কুত আল আমারা-তে এমন সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলাম যেন তা একটি দেহের মতো। এখন আমরা যদি আবার একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারি তাহলে এই ধরনের 'সন্ত্রাসী' ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো। যেহেতু, 'জাতি হিসেবে কাফিররা এক' সুতরাং তাদের মোকাবেলায় আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কাফিররা নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে একই ধরনের বিদ্বেষী পদক্ষেপ নিতে পারে, তাহলে কেন আমরা একই দ্বীন, একই ইতিহাস এবং একই সংস্কৃতির বাহক হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না? জাতি হিসেবে এক হওয়া সত্ত্বেও কেন আমরা একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছি না? এর কারণ হচ্ছে, উম্মাহ্ হিসেবে আমরা বৃহৎ হলেও, আমরা নেতৃত্বশূণ্য, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উল্লেখিত হাদিসটিতে বলেছেন: **"ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল যার নেতৃত্বে তোমরা যুদ্ধ করবে এবং নিজেদের রক্ষা করবে"** – আর এই ইমাম বা নেতৃত্ব হচ্ছেন সৎপথপ্রাপ্ত খলিফা যিনি মুসলিমদের একই ছাদের নীচে ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা সেভাবে একই ছাদের নীচে ঐক্যবদ্ধ হবো, যেভাবে অতীতে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতে রাশেদাহ্'র অধীনে হয়েছিলাম। এটা সেই খিলাফতে রাশেদাহ্ যেটাকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা শত বছর ধরে ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল এবং এখন তারা আবার সেটার পুনরুত্থানকে যেকোনো মূল্যে ঠেকাতে চায়। তাই মুসলিমদের উচিত সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা, কারণ 'সন্ত্রাস'সহ সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আর এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক মুক্তির সুসংবাদ। আর তাই আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যেমনটা আল্লাহ্ আয ওয়া যাল আমাদের আদেশ দিয়েছেন: **"এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।"** [সূরা আস-সাফফাত : ৬১]

২৩ জিলক্বদ, ১৪৩৭ হিজরী
২৬ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

...০৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

লিফলেট: রোহিঙ্গা মুসলিমদের রক্ষা করার...

নিয়েছে, যে কিনা মুসলিমদের সাগরে নিক্ষেপ করছে, হত্যাকারীদের হাতে অর্পণ করছে!

হে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ!

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদা তাওয়াফরত অবস্থায় কা'বাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

"...কতোই না তোমার সম্মান, কতোই না তোমার মর্যাদা! কিন্তু যেই সত্ত্বার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর কসম, আল্লাহ্'র নিকট একজন ঈমানদারের রক্ত ও সম্পদ তোমার মর্যাদার তুলনায় অনেক বেশী!" [ইমাম আল-মুনদিরি কর্তৃক তারগীব ওয়া'ল তারহিব-এ বর্ণিত, ৩/২৭৬]

আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদের এই মর্যাদাকে রক্ষা করা। অবিলম্বে এই সরকারকে অপসারণ করুন এবং আমাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন; **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সম্মানিত আমির খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং আপনাদের ভাই-বোনদের মুক্ত করতে আপনাদেরকে জিহাদে নেতৃত্ব দিবেন। আপনারা কি আপনাদের নির্যাতিত ভাই-বোনদের কান্না শুনতে পাননা? তাদের রক্তাক্ত অবস্থা এবং ধ্বংসস্তুপ কি আপনাদের চোখে পড়েনা? তাদের নিদারুন কষ্ট দেখে আপনাদের হৃদয়ে কি রক্তক্ষরণ হয়না? তাদের অসহায় মুখগুলো দেখে আপনাদের কি একটুও দয়া হয়না, একটুও মায়া হয়না? আমরা জানি নিঃসন্দেহে আপনারা তাদের ভালোবাসেন, তাদের ব্যাথা হৃদয়ে অনুভব করেন, এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করছেন এবং তাদের আত্মচিৎকার শুনছেন। সুতরাং, নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কিংবা নিজের সাথে প্রতারণা করে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে বলবেন না যে আপনাকে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে হবে। এবং শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সংবিধানের মূল্য এক টুকরো লিখিত কাগজের চেয়ে বেশী কিছু নয়, সরকার যে কিনা তা প্রণয়ন করেছে, সেও এর তোয়াক্কা করে না। সরকারের শিকল ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করুন, যে কিনা আপনাদেরকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের নামে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রেরণ করে, অথচ আপনাদের পার্শ্ববর্তী দেশের ভাই-বোনদের রক্ষায় নীরব থাকে। ফলাফল বা পরিণতির ভয়ে আর ভীত থাকবেন না, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা রাখুন, ইনশা'আল্লাহ্ আপনারাই সফলকাম হবেন।

"এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র উপর ভরসা রাখে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ ধার্য করে রেখেছেন।" [সূরা আত-তালাক : ৩]

হে আল্লাহ্! এদেশের সেনাঅফিসারদের মধ্য হতে এমন কিছু সাহসী পুরুষের উত্থান ঘটান যেন তারা আমাদের এই আহ্বানকে সাদরে গ্রহণ করে, এবং আমাদের অসহায় ভাই-বোনদেরকে শত্রুর এবং আমাদেরকে যালিম হাসিনার যুলুমের কবল থেকে মুক্ত করে। আমিন!

২৯ সফর, ১৪৩৮ হিজরী
২৯ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

নিবন্ধঃ

খিলাফত এবং এর ফিকহ্ সম্পর্কে হানাফী আলেমগণের মতামত

অন্যান্য মাযহাবের আলেমগণের মত হানাফী আলেমগণও খিলাফতের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ক্রমাগতভাবে সকল যুগেই। বস্তুতঃ অন্যান্য আলেমগণের চেয়ে হানাফী আলেমগণকে শাসন ও সরকার পরিচালনার মত বিষয়গুলোতে বেশি বক্তব্য দিতে হয়েছে; কারণ অনেক খলিফারাই (মূলতঃ আব্বাসীয় ও উসমানীয় খলিফারা) হানাফী মাযহাবকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গ্রহণ করেছিলেন এবং তৎকালীন সময়ের হানাফী আলেমগণের নিকট পরামর্শ ও আইনের বিষয়ে জানতে চাইতেন। যেমন, আব্বাসীয় খলিফা হারুন আর রশিদ, আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ও সহচর আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট প্রশ্ন লিখে রাষ্ট্রের অর্থায়নের ব্যবস্থাপনা নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে আবু ইউসুফ লিখে পাঠিয়েছিলেন তার বিখ্যাত ও চমৎকার রচনা "আল-খারাজ" যাতে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের নানাবিধ শারী'আহ্ নিয়মের বিশদ ব্যাখ্যা ছিল ।

এই নিবন্ধে আমরা খিলাফত সম্পর্কে হানাফী আলেমগণের বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরবো যাতে উলামাগণ, শারী'আহ্ জ্ঞানের ছাত্রবৃন্দ ও পাকিস্তানের খিলাফতের রাজনৈতিক কর্মীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যাদের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

ইমাম আন-নাসাফি (৫৩৭ হিজরী) খিলাফতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন তার আক্বীদাহ্ বিষয়ক বিখ্যাত "আক্বাঈদ আল-নাসাফিয়া" রচনার ৩৫৪ নং পৃষ্ঠায়: *"মুসলিমদের অবশ্যই একজন ইমাম থাকতে হবে, যার দায়িত্ব হলো আহ্কাম বাস্তবায়ন, হুদুদ রক্ষণাবেক্ষণ, সীমান্তগুলো পাহারা, সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত, যাকাত গ্রহণ, বিদ্রোহী, চোর ও মহাসড়কের ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ, জুমু'আ ও দুইটি ঈদ প্রতিষ্ঠিত, জনগণের মধ্যকার বিভেদের মীমাংসা, আইনী অধিকারের ভিত্তিতে স্বাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ; অভিভাবকহীন যুবক-যুবতীদের বিয়ের ব্যবস্থা এবং গণীমতের মাল বিতরণ করা।"*

তিনি এখানে তুলে ধরেছেন ইসলামে খিলাফত রাষ্ট্র কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং দেখিয়েছেন যে, ইসলামের অসংখ্য মৌলিক দায়িত্বগুলো (ফরয) কিভাবে এর উপর নির্ভরশীল এবং সঠিকভাবে পালন করা অসম্ভব।

নাসাফি (রহ.)-এর এই বক্তব্যের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম সাদ আল-দীন আল-তাফতাযানি (রহ.) যিনি একজন শাফী মাযহাবের আলেম কিন্তু 'আক্বাঈদ আল-নাসাফি'-এর সবচেয়ে সুপরিচিত ব্যাখ্যাটি লিখেন এবং অসংখ্য চমৎকার গ্রন্থের রচয়িতা যেগুলো ব্যাপক হারে পাকিস্তানের মাদরাসাগুলোতে পঠিত হয় যেমন: 'মুখতাদার আল মা'নী' (বানাগা) বলেন,

"আলেমগণের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে যে একজন খলিফা নিয়োগ করা আবশ্যিক (ফরয)। শুধুমাত্র এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে এই দায়িত্ব কি আল্লাহ্'র না মানুষের এবং এটার দলিল কি লিখিত (নাকলী) না যৌক্তিক (আকলী)। সঠিক মতামত হচ্ছে এই দায়িত্ব মানুষের যা লিখিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত, কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"যে তার সময়কার ইমামকে না জেনে মৃত্যুবরণ করলো তার মৃত্যু জাহেলী যুগের মৃত্যু"** *এবং এই কারণেও যে, উম্মাহ্ (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর একজন ইমাম নিয়োগ করাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন-এর চাইতেও এই কাজকে অধিক গুরুত্ব দেন; একইভাবে সকল ইমাম এর মৃত্যুর পরও এমনই করা হয়েছে। এবং এছাড়া আরেকটি কারণ হচ্ছে অন্যান্য শারী'আহ্ দায়িত্বগুলো এর উপরই নির্ভরশীল।"* (শরহু আল-আক্বাঈদ আল-নাসাফিয়া, পৃষ্ঠা নং ৩৫৩-৩৫৪)

ইমাম আল-তাফতাযানি (রহ.) এখানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেন। প্রথমত, খিলাফত রাষ্ট্র ফরয হওয়ার বিষয়ে আলেমগণের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মতপার্থক্যের বিষয়ে তিনি যা উল্লেখ করেন তা হচ্ছে মূলতঃ শিয়াদের ব্যাপারে যারা মনে করতো এটা ফরয কিন্তু আল্লাহ্'র উপর (এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে ইমামগণ আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনিত) এবং মুতাযিলাদের ব্যাপারে যারা মনে করতো এটা একটি ফরয বিষয় যা মনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত (মনের ভিত্তিতে কিছু ফরয দায়িত্ব আসতে পারে – যা তাদের উসুলের ভিত্তি)। যদিও তিনি উল্লেখ করেন যে চার মাযহাবের সকল আলেমগণের মতে সঠিক মতামত হচ্ছে লিখিত দলিল (কুর'আন ও হাদীস)-এর আলোকে খিলাফত রাষ্ট্র মানুষের উপর একটি ফরয দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, সহীহ্ মুসলিম-এর ইমামত (সরকার পরিচালনা) অধ্যায়ের একটি হাদিস তিনি উল্লেখ করেন যেখানে মহানবী (সাঃ) বলেন, **"যে ব্যক্তি আনুগত্যের শপথ (একজন খলিফার নিকট বাই'আত) ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু জাহেলী যুগের মৃত্যু।"** এখানে জাহেলী যুগের মৃত্যু বলতে হারাম বুঝাচ্ছে; ইবনে হাযর তার ফাতহ্-আল-বারী'তে এমনই ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয়ত, তিনি একটি সুবিদিত সত্য ঘটনার উল্লেখ করেন, মহান সাহাবাগণ (রা.) খিলাফতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন বিলম্বে করেন, খিলাফতকে অগ্রাধিকার দেন। চতুর্থত, অন্যান্য সকল দায়িত্বের চেয়ে খিলাফতের দায়িত্ব যে অধিকতর গুরুত্ববহ তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: এটি শুধুমাত্র একটি ফরয দায়িত্ব নয় বরং এমন একটি ফরয দায়িত্ব যার উপর অন্যান্য ফরয দায়িত্বসমূহ নির্ভর করে (যেমন নাসাফি (রহ.) যে দায়িত্বগুলো উল্লেখ করেছেন), সুতরাং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার মূলক।

এখানে আরো একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, খিলাফত সম্পর্কিত আলোচনাগুলো আক্বীদাহ্ বিষয়ক বইগুলোতে আলোচিত হয়েছে যদিও খিলাফত কোন আক্বীদাহ্'গত বিষয় নয় বরং ফিকহ্ সম্পর্কিত বিষয়। এর কারণ হচ্ছে খিলাফতের ব্যাপারে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের মাযহাবের ভুল অবস্থান ছিল। সুতরাং এই বিষয়ক বির্তকের মূলে বিশ্বাসগত (আক্বীদাহ্'গত) কারণ ছিল এবং যেহেতু ইসলামে এটি খুবই গুরুত্ববহ ব্যাপার সেহেতু আলেমগণ আক্বীদাহ্'র বইতে খিলাফতের আলোচনা করেন।

এজন্যই অনেক আলেম খিলাফতকে ইমামত হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ শিয়াদের মত কিছু মাযহাবের লোকজনের সাথে বিতর্কে 'ইমামত' শব্দটি জনপ্রিয় ছিল। উল্লেখ্য যে, ইমামত ও খিলাফত উভয় শব্দ সমার্থক এবং এর দ্বারা মুসলিমদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝায়, যিনি ইসলাম বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। ইমাম ও খলিফা শব্দ দুটোও সমার্থক এবং এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যার মাধ্যমে এই নেতৃত্ব বাস্তবরূপ লাভ করে অথবা

আধুনিক পরিভাষায় খিলাফত রাষ্ট্রের প্রধানকে বুঝায়। মহানবীও (সাঃ) এই বিষয়ে উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন। যেমন, খিলাফতের ঐক্যের গুরুত্ব সংক্রান্ত মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"যদি দুইজন খলিফাকে আনুগত্যের বাই'আত দেয়া হয় তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা কর।"** খিলাফতকে ঢাল হিসেবে বর্ণনা করে মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"প্রকৃত পক্ষে, ইমাম হচ্ছে ঢাল..."**

উপমহাদেশের সুপরিচিত আলেম শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীও (১১৫২ হিজরী) খিলাফতের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। *"জেনে রাখ মুসলিম জামায়াতের জন্য একজন খলিফার উপস্থিতি অপরিহার্য কারণ তার উপস্থিতি ব্যতীত উম্মাহ্'র অনেক স্বার্থই সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না।"* (হুজ্জাত আল্লাহি আল-বালিগা, ২:২২৯)

অবশ্যই হানাফি ফিকহ্-এর অনেক বইতেও খিলাফতের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ১২শ হিজরী শতকের দামাস্কাস-এর প্রখ্যাত শা'ম'ই আলেম মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদিন (১২৫২ হিজরী) এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। যিনি সম্ভবত পরবর্তী যুগের হানাফী আলেমগণের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত, বিশেষতঃ এই উপমহাদেশে। তিনি হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত নিরীক্ষাকারী (খাতিমাত আল-মুহাক্কিকিন) হিসেবে পরিচিত। তার 'রাদ আল-মুহতার' (সংশয়ের জবাব) গ্রন্থ, যেটির অন্য নাম হাসিয়াত ইবন তাবিদিন; এটাকে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বিষয়ে চূড়ান্ত বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটি একটি বিশদ ব্যাখ্যামূলক রচনা ১১ হিজরী শতকের বিজ্ঞ হানাফী ফকিহ্ আলাদীন আল-হাসকাফি (১০৮৮ হিজরী) এর চমৎকার রচনা 'দুর আল-মুখতার' (মুক্তো বাছাই) গ্রন্থের, যেটি আবার গাজার আল-তুরতুমাশি (১০০৪ হিজরী) রচিত 'তানউইর আল-আবাসা' গ্রন্থের ব্যাখ্যা।

ইমাম আল-হাসকাফি তার 'দুর আল-মুখতার' গ্রন্থে লিখেন (ইবনে আবিদিন এর ব্যাখ্যা), "মূল ইমামত (খিলাফত) হচ্ছে জনগণের উপর সাধারণ কর্তৃত্বের অধিকার। এর আলোচনা ইলম আল-কালামের অংশ এবং এটা প্রতিষ্ঠা করা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব (শারী'আহ্'র অসংখ্য দায়িত্ব পালন এর উপর নির্ভর করায় এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব)। আর একারণেই সাহাবাগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন এর চাইতে এটাকে অগ্রাধিকার দেন [তিনি (সাঃ) সোমবার মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে দাফন করা হয় মঙ্গলবার দিনে বা বুধবার দিনে বা রাতে (বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী), এবং এই সুন্নাহ্ এখনো চালু রয়েছে যে নতুন খলিফা নিয়োগের পূর্বে বিগত খলিফাকে দাফন করা হয় না] (রাদ আল-মুহতার আলা আল-দুর আল-মুখতার, ১:৫৪৮)

অতএব, ইমাম হাসকাফি খিলাফতকে সংজ্ঞায়িত করেন জনগণের উপর সাধারণ কর্তৃত্ব হিসেবে। এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন জনগণের কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা করা একটি অধিকার এবং একটি চূড়ান্ত অধিকার যার অর্থ সামগ্রিকভাবে খিলাফত রাষ্ট্রে অবস্থানরত সকল জনগণ ও তাদের কর্মকান্ড এর আওতাভুক্ত। এই অধিকার গভর্ণর ও বিচারকদের সীমিত অধিকারের বিপরীত, যাদের অধিকার শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট এলাকার কিছু সংখ্যক মানুষের উপর বর্তায়।

এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবন আবিদিন (রহ.) উদ্ধৃত করেন 'শরহু আল-মাকাসিদ' গ্রন্থে তাফতাযানির সংজ্ঞাকে, যিনি খিলাফতকে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে, "দ্বীন ও দুনিয়ার কর্মকান্ডের উপর সাধারণ নেতৃত্ব যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উত্তরসূরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।"

সংজ্ঞার শেষাংশ নির্দেশ করে যে খিলাফত হচ্ছে মহানবী (সাঃ)-এর উত্তরসূরীর পদ। এর অর্থ হচ্ছে মহানবী (সাঃ) উত্তরসূরী হিসেবে শারী'আহ্ বাস্তবায়নই খিলাফতের কাজ। এ কারণেই তাকে বলা হয় খলিফা যার শাব্দিক অর্থ উত্তরসূরী।

তারপর আল-হাসকাফি খলিফা হওয়ার জন্য শর্তসমূহ আলোচনা করেন। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কিছু শর্ত যেমন: মুসলিম, মুক্ত, পুরুষ, সুস্থ মস্তিস্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক ও সক্ষম হওয়া এবং কিছু শর্ত যেগুলোর বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যেমন: কুরাইশ, মুজতাহিদ ও সাহসী হওয়া ইত্যাদি শর্তসমূহ উল্লেখ করেন। কিছু দলের দাবী অনুযায়ী হাশেমী, আলাওয়ী বা ত্রুটিমুক্ত হওয়ার শর্তসমূহ তিনি খন্ডন করেন।

শাসন ও সরকার পরিচালনার ফিকহ্ এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আরও বলা যায়, এই বিষয়ে অনেক হানাফীদের কাজ রয়েছে যারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন; আবু ইউসুফ (১৬২ হিজরী)-এর কিতাব আল-খারাজ থেকে শুরু করে ইমাম মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান আল শায়বানি (১৮৯ হিজরী)-এর আল-সিয়ার আল-সাগীর ও আল-সিয়ার আল-কাবীর; দুইজনই আবু হানিফার ছাত্র। পরবর্তী যুগের অনেকেও এই বিষয়ে লিখেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, হানাফী মাযহাবের আলেমগণ খিলাফতকে চূড়ান্তভাবে গুরুত্ব দিতেন। ফলে বর্তমানের আলেম ও শারী'আহ্ জ্ঞানের ছাত্রদের এই বিষয়ে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া এবং নবুয়্যতের আদলে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য এগুলো উৎসাহ হিসেবে কাজ করবে।

হিযবুত তাহ্রীর-*এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া কার্যালয়ের জন্য লিখেছেন*
ওসমান বদর

■

...০৮ পৃষ্ঠার পর থেকে

হে মুসলিম তরুণ! আপনি কি নিখোঁজ...

তরুণদের প্রতি আমাদের আহ্বান: আমরা বিশ্বাস করি যে, তরুণ হিসেবে ইসলাম এবং ইসলামের রাজনৈতিক দিকগুলোকে উপলব্ধি এবং এ বিষয়ে পড়াশোনা করা প্রয়োজন। তরুণদের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, তারা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করবে এবং দুর্নীতিগ্রস্থ পশ্চিমা মূল্যবোধ ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের সমাধানগুলোর প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে দিবে।

আমরা আপনাদেরকে বলছি, অনুগ্রহ করে ভীতিসঞ্চারকারী ও নিন্দুকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। ইসলাম কিংবা আপনাদের ঈমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হতে বিরত থাকবেন না।

আমরা বর্তমানে যে সংকটের সম্মুখীন তার সমাধান এটা নয় যে, আমাদেরকে আরও অধিক পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ ও চিন্তার বিষকে গলধঃকরণ করতে হবে। বরং, ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কে বেশি করে আলোচনা করতে হবে এবং ইসলাম কিভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে একটি ন্যায়সঙ্গত, বৈষম্যহীন ও নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে তা তুলে ধরতে হবে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"আর যে ব্যাপারেই তোমরা মতানৈক্য কর, তার মিমাংসাতো আল্লাহ্'র নিকটই রয়েছে; তিনিই আল্লাহ্, আমার রব, তাঁর উপরই আমার ভরসা এবং তাঁর দিকেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।"** [সূরা আশ্ শূরা : ১০]

১৭ জিলকদ, ১৪৩৭ হিজরী
২০ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

■

ধারাবাহিক : গত সংখ্যার পর থেকে...

খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ব্যাখ্যা অথবা এর প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ

ধারা: ৪

যাকাত, জিহাদ এবং উম্মাহ্'র একতাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা ব্যতিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ('ইবাদাত) সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে খলিফা সুনির্দিষ্ট শারী'আহ্ আইন গ্রহণ করবেন না, এবং ইসলামী আক্বীদাহ্'র সাথে সম্পর্কিত চিন্তাসমূহের মধ্য থেকে কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাকে নির্ধারণ করে দিবেন না।

এ বিষয়ে সাহাবাদের (রা.) ঐক্যমত্য রয়েছে যে, খলিফার এককভাবে আইন গ্রহণের অধিকার রয়েছে এবং এই ঐক্যমত্য থেকে শারী'আহ্'র দুটি বিখ্যাত মূলনীতির উদ্ভব হয়েছে: "ইমামের আদেশ মতভেদের অবসান ঘটায়" এবং "ইমামের আদেশ ঐক্যবদ্ধ করে"। খলীফা আল-মামুনের সময়কার একটি ঘটনায় (কুর'আন সৃষ্টি সংক্রান্ত ফিতনা বা বিবাদ) আক্বাইদের (আক্বীদাহ্'র বহুবচন, বিশ্বাসসমূহ) সাথে সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট চিন্তাসমূহ গ্রহণ করা হয়, যা খলিফার জন্য ফিতনা বয়ে আনে এবং মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা বা কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে। সেজন্য খলিফা আক্বিদাহ্ ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারেন, যাতে এধরনের সমস্যা দেখা না দেয় এবং মুসলিমদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকে ও তাদের আস্থা অর্জন করা যায়। যাহোক, আক্বাইদ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার মানে এটা নয় যে খলিফার জন্য তা নিষিদ্ধ, বরং এর মানে হচ্ছে যে খলিফা আইন গ্রহণ, বা আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা – এ দুইয়ের মধ্যে আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাকেই পছন্দ করবেন। অতএব, তিনি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ নাও করতে পারেন। একারণেই এই ধারাটিতে বলা হয়েছে যে, খলিফা "সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করেন না" এবং এটা বলা হয়নি যে, খলিফার জন্য "সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ নিষিদ্ধ", যা নির্দেশ করে যে তিনি সুনির্দিষ্ট আইন নাও গ্রহণ করতে পারেন।

দু'টি বিষয়ের ভিত্তিতে খলিফা আক্বাইদ ও ইবাদতের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন, প্রথমতঃ এই সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে জনগণকে একটি সুনির্দিষ্ট মতামত অনুসরণে বাধ্য করার কঠিন সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণে খলিফাকে যে বিষয়টি উৎসাহিত করে সেটি হচ্ছে, বাস্তবে একটিমাত্র মতামত গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থার একতাকে সুরক্ষিত করা। তাই তিনি জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করেন না।

প্রথম ক্ষেত্রে: অমুসলিমদের উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আক্বীদাহ্ গ্রহণে বাধ্য করাকে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগে বাধ্য করাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোতে শারী'আহ্ আইন মেনে চলতে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং, বৃহত্তর কারণে এটা বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের বিশ্বাসসমূহ ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধানসমূহ পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ শারী'আহ্ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সেগুলো পরিত্যাগে বাধ্য করা যাবে না। এছাড়াও, বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত চিন্তাসমূহ পরিত্যাগে বাধ্য করার বিষয়টি কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে এবং সেসব চিন্তার প্রতি আনুগত্যকে সন্দেহাতীতভাবে আরও উদ্দীপ্ত করবে, এর প্রমাণ হচ্ছে: ইমামদের সাথে বিরোধসমূহ, উদাহরণস্বরূপ: কুর'আন সৃষ্টির ফিতনা বিষয়ে ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের সাথে যা ঘটেছিল। যখন তাদেরকে প্রহার ও অপমান করা হয়েছিল তখন তারা বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং তাদের বিশ্বাসও পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"(আল্লাহ্) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।"** [সূরা আল হাজ্জ : ৭৮]

যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বা ইবাদতসমূহ বিশ্বাসের মতো সেহেতু শারী'আহ্'র বিধান হিসেবে ভিন্নমত পোষণকারী মানুষের উপর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করা হলে সেটা তার জন্য পীড়াদায়ক হবে, কারণ এই বিষয়গুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র সাথে মানুষের সম্পর্কের আওতাধীন এবং এবং আক্বীদাহ্'র সাথে পরিবেষ্টিত। অতএব, খলিফার কোন অবস্থাতেই এমন কোন সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা উচিত নয় যা মুসলিমদের জন্য মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে। তবে এটা করা খলিফার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে: বিশ্বাসসমূহ ও ইবাদতসমূহ হচ্ছে মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্গত এবং এগুলো হতে সমস্যার উদ্ভব হয় না, কিন্তু লেনদেন ও শাস্তির বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ এগুলো সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘটে থাকে এবং এ ধরনের সম্পর্কসমূহ হতে সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে। লেনদেনের মূলে রয়েছে বিরোধের নিষ্পত্তি এবং খলিফা কর্তৃক গৃহীত সুনির্দিষ্ট আইনের মূলে রয়েছে জনগণের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা। সম্পর্কসমূহ হিসেবে জনগণের মধ্যে যা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে খলিফা তাদের বিষয়াদি প্রকাশ্যেই সমাধান করবেন এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ্'র সাথে তাদের

সম্পর্কের অন্তর্গত কোন বিষয়ের সাথে, কিংবা তাদের বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত কোন কিছুর সাথে এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

একারণে, বাস্তবিকভাবে শুধুমাত্র জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য খলিফা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করতে পারেন এবং জনগণ ও আল্লাহ্'র মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের কোন যৌক্তিক বাস্তবতা নেই। অতএব, সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বাস্তবতা হচ্ছে যে, একমাত্র জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে এবং সার্বজনীন বা প্রকাশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এটা করা হতে পারে। সুতরাং, মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিংবা বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। এর ভিত্তিতেই খলিফা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করবেন না। যদিও এটা করা তার জন্য নিষিদ্ধ নয়।

সুতরাং, মর্মপীড়া বা প্রায়োগিক সমস্যা এবং সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের যৌক্তিক বাস্তবতার সাথে বিরোধ – এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে খলিফা বিশ্বাস ও ইবাদত সংক্রান্ত বিধিবিধানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করবেন না। কিন্তু, যদি কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের (আক্বিদাহ্'র) ক্ষেত্রে কুর'আন ও সুন্নাহ্তে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে সুনির্দিষ্ট আইন (উক্ত বিশ্বাসের উপর নিষেধাজ্ঞা) গ্রহণ করা হবে। যদিওবা এটা প্রয়োগে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিংবা তা সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যাতে শারী'আহ্'কে অগ্রাধিকার দেয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ: দৃঢ় প্রত্যয় ব্যতিত বিশ্বাসসমূহ গ্রহণ করা যাবে না। একইভাবে, যদি মুসলিমদের বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার জন্য জনগণকে একটি সুনির্দিষ্ট আইনের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে এটা করা যেতে পারে, মুসলিমদের ধর্মসভা ও রাষ্ট্রের মধ্যে একতা বজায় রাখার নির্দেশের বিষয়টি কুর'আন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: হজ্ব ও রমযানের সময় নির্ধারণ, ঈদ উদযাপন, যাকাত এবং জিহাদ।

এই বিষয়গুলোতে খলিফা সুনির্দিষ্ট শারী'আহ্ বিধান গ্রহণ করবেন, যদিওবা আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রে কোন কিছু মানতে বা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় না, বরং গৃহিত বিশ্বাসটিই বলবৎ করা হয়। এটা সেই উৎস থেকে এসেছে যা বর্ণনা ও অর্থের (ক্বাতি' সুবুত, ক্বাতি' দালালাহ্) দিক দিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত। ইবাদতের এইসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন গ্রহণ করা হলে তাদের মধ্যে কোনরূপ মর্মপীড়া দেখা দিবে না, কারণ এগুলো নামাযের মতো কেবলমাত্র মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এই বিষয়গুলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে জড়িত, যেমন: উৎসবসমূহ। এই কারণে বিশ্বাস এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান গ্রহণ অনুমোদিত।

কোন একটি চিন্তা আক্বীদাহ্ থেকে নাকি শারী'আহ্'র বিধি-বিধান থেকে উদ্ভুত হয়েছে তা নির্ভর করবে শারী'আহ্ দলিলের উপর। সুতরাং, যদি শারী'আহ্'র দলিলটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে তা হচ্ছে শারী'আহ্'র বিধি-বিধান, কারণ শারী'আহ্ আইন হচ্ছে আইন-প্রণেতার হুকুম যা বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত, এবং যদি তা বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কিত না হয় তবে তা আক্বিদাহ্'র অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, আক্বিদাহ্ ও শারী'আহ্ বিধিবিধানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে: যেসব বিষয়ের উপরে শুধুমাত্র ঈমান আনতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোন ধরনের কাজকে সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি, সেসব বিষয় আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত, উদাহরণস্বরূপ: অদৃশ্যের বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনী এবং তথ্যসমূহ। যে বিষয়গুলো থেকে কাজের নির্দেশ আসে সেগুলো শারী'আহ্ বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্'র তরফ থেকে নাযিলকৃত নিম্নোক্ত আয়াতটি আক্বীদাহ্'র সাথে সম্পর্কিত: **"হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে কিতাব তিনি তাঁর রাসুলের উপর নাযিল করেছেন সেটার উপর এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তার প্রতি।"** [সূরা নিসা : ১৩৬], **"আল্লাহ্ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।"** [সূরা যুমার : ৬২], **"আর এ কিতাবে বর্ণনা করেন মরিয়মের কথা..."** [সূরা মারইয়াম : ১৬], এবং অন্য আয়াত সমূহে: **"সেদিন মানুষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে; এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো।"** [সূরা কারি'আ : ৪-৫]। এ সবগুলোই আক্বীদাহ্'র অন্তর্ভূক্ত, কারণ এগুলো বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; এগুলোর উপরে শুধুমাত্র ঈমান আনতে হবে এবং এগুলোর ভিত্তিতে কোন কাজের নির্দেশ নেই। এছাড়াও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: **"এবং আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন"** [সূরা বাক্বারা : ২৭৫], **"যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক দেবে।"** [সূরা তালাক : ৬], এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন: **"আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে।"** [সূরা নিসা : ৫৮], এই আয়াতগুলো শারী'আহ্ বিধানের অন্তর্ভূক্ত, কারণ এগুলো বান্দার কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলোর ভিত্তিতে কাজ করার হুকুম বিদ্যমান।

এর ভিত্তিতে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই যে নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তিনিই (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী তা বিশ্বাস করা আক্বীদাহ্'র অন্তর্গত, কারণ এর উপর ঈমান আনতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ইমামত বা ভিন্ন শব্দে খিলাফত আক্বীদাহ্'র অন্তর্গত বিষয় নয়, কারণ এটা ঐসব বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর সাথে কাজকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা আক্বীদাহ্ থেকে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল ধরনের গুণাহ্ থেকে মুক্ত। উপরন্তু, কুরাইশ, আহল আল-বাইত (নবীর পরিবার) থেকে কিংবা সকল মুসলিমের মধ্য থেকে যেকোন মুসলিমের খলিফা হওয়ার বিষয়টি শারী'আহ্ বিধানের অন্তর্ভূক্ত এবং এটি আক্বীদাহ্'গত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়, কারণ এটা বান্দার কাজের সাথে ও খলিফা হওয়ার শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই অর্থে, কাজের সাথে সম্পর্কহীন সকল বিষয় বা যেসব বিষয়র উপর শুধুমাত্র ঈমান আনতে হয়েছে সেগুলো আক্বীদাহ্'র অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু যেসব বিষয়ের সাথে বান্দার কাজের সম্পর্ক রয়েছে ও যেগুলোর ভিত্তিতে কাজ করতে বলা হয়েছে সেগুলো শারী'আহ্ বিধানের অন্তর্ভূক্ত।

আক্বীদাহ্'র বাস্তবতা হচ্ছে যে এটি একটি মৌলিক চিন্তা; এর অর্থ হচ্ছে যে, আক্বীদাহ্ হতে হলে অন্য সবকিছুকে পরিমাপের মৌলিক মাপকাঠি হিসেবে এটাকে নিতে হবে; অতএব, যদি কোন চিন্তা মৌলিক না হয় তবে তা আক্বীদাহ্ হিসেবে গণ্য হবে না। এছাড়াও, আক্বীদাহ্ হচ্ছে মহাবিশ্ব, মানুষ ও জীবন, এ জীবনের পূর্বে কি ছিল ও এরপরে কি আসবে এবং এই জীবনের সাথে এর পূর্বে কি ছিলো ও এরপরে কি আসবে সে সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা। এই সংজ্ঞা প্রত্যেক আক্বীদাহ্'র জন্য প্রযোজ্য এবং এটা ইসলামী আক্বীদাহ্'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সংজ্ঞার মধ্যে অদৃশ্যের বিষয়গুলোও অন্তর্ভূক্ত, সেই মোতবেক এই সামগ্রিক চিন্তা থেকে উৎসারিত সকল চিন্তা আক্বীদাহ্ থেকে আসে। সুতরাং আল্লাহ্, বিচার দিবস, মহাবিশ্বের সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত এবং এধরনের সবকিছু আক্বীদাহ্'র অংশ, কিন্তু এগুলোর সাথে সম্পর্কহীন বিষয়সমূহ আক্বীদাহ্'র অন্তর্ভূক্ত নয়।

(চলবে...)

■

ধারাবাহিক : গত সংখ্যার পর থেকে...

খিলাফত রাষ্ট্রের কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানসমূহ *(শাসন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা)*

গভর্ণরবৃন্দ (উলা'হ্)

ওয়ালী (গভর্ণর) হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাকে খলিফা খিলাফত রাষ্ট্রের ভেতর কোন একটি উলাই'য়াহ্ বা প্রদেশে শাসক এবং আমীর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ভূমিসমূহকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি প্রদেশ একটি উলাই'য়াহ্ হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রতিটি উলাই'য়াহ্'কে আবার কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হবে এবং প্রতিটি জেলাকে ইমালাহ্ বলা হবে। উলাই'য়াহ্'র দায়িত্বে যাকে নিযুক্ত করা হবে তাকে ওয়ালী বা আমীর বলা হবে এবং ইমালাহ্'র দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমীল বা হাকীম বলা হবে।

প্রতিটি ইমালাহ্ আবার কয়েকটি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত, যাদের প্রত্যেককে কাসাবাহ্ (মেট্রোপলিস) বলা হয়। কাসাবাহ্'সমূহ আরও ছোট প্রশাসনিক এককে বিভক্ত যাদের প্রত্যেকটিকে হাই'ই (Hayy) বা কোয়ার্টার বলা হয়। কাসাবাহ্ এবং হাই'ইর প্রধানদের ব্যবস্থাপক (manager) বলা হয় এবং তাদের কাজ প্রশাসনিক।

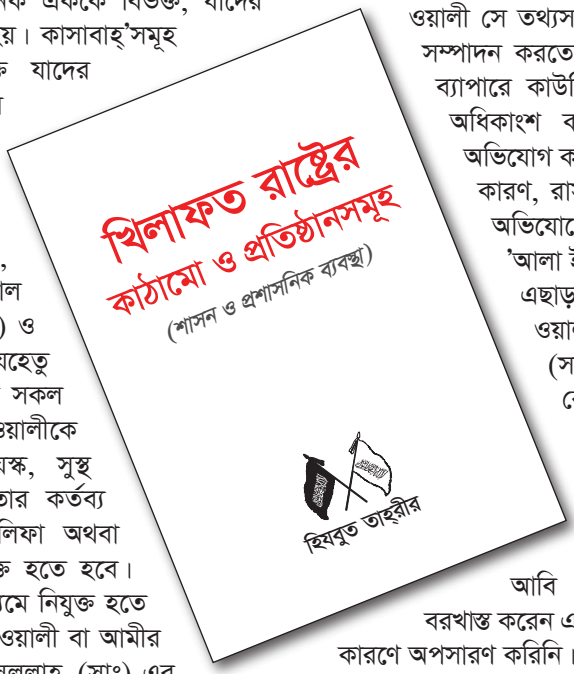

ওয়ালী হলেন একজন শাসক। কারণ, উলাই'য়াহ্'র অর্থই হচ্ছে শাসন করা। আল মুহিত অভিধানে, এটাকে নেতৃত্ব (ইমারাহ্) ও কর্তৃত্ব অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেহেতু তারা শাসক সেহেতু তাদের শাসক হবার সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। সে কারণে ওয়ালীকে অবশ্যই পুরুষ, মুক্ত, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, ন্যায়পরায়ন এবং তার কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্য হতে হবে। তাকে খলিফা অথবা খলিফার পক্ষ থেকে কারও মাধ্যমে নিযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ, ওয়ালীগণ কেবলমাত্র খলিফার মাধ্যমে নিযুক্ত হতে পারেন। উলাই'য়াহ্ অথবা ইমারাহ্ অর্থাৎ ওয়ালী বা আমীর নিয়োগের বিষয়ে দলিল পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শাসনামল থেকে। বিভিন্ন বর্ণনানুসারে এটা নিশ্চিত যে, তিনি (সাঃ) বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়ালীদের নিয়োগ দিতেন এবং তাদের প্রদেশসমূহে শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করতেন। তিনি (সাঃ) মুয়াজ ইবন জাবালকে আল-জানাদে, যিয়াদ ইবনে লাবিদকে হাজরা মাউতে এবং আবু মুসা আল আশয়ারীকে জাবিদ এবং এডেনে (ওয়ালী হিসাবে) নিযুক্ত করেছিলেন।

যারা শাসনকার্যে যোগ্য, জ্ঞানী ও পরহেজগার (আল্লাহ্ভীরু) বলে পরিচিত ছিলেন তাদেরই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়ালী হিসেবে মনোনীত করতেন। তিনি (সাঃ) তাদের মধ্য হতে ওয়ালী বাছাই করতেন যারা এই কাজে পারদর্শী ছিল এবং যারা মানুষের হৃদয়ে ঈমানের আলো ও রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করতে সক্ষম ছিল। সুলাইমান ইবনে বারুদা তার বাবার বরাত দিয়ে বলেন,

"যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন অভিযান কিংবা সেনাবাহিনীতে একজন আমীর নিয়োগ করতেন, তখন তিনি (সাঃ) তাকে **আল্লাহ্'কে ভয় করতে এবং তার সহযোগী মুসলিমদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন।**" মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে; (আল-বায়হাকী, সুনান আল কুবরা, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪১)।

যেহেতু ওয়ালী একটি উলাই'য়াহ্'র আমীর, সেহেতু তার ক্ষেত্রেও এ হাদিস প্রযোজ্য।

ওয়ালীকে বরখাস্ত বা অপসারণ করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এর ভার খলীফার উপরই ন্যস্ত থাকবে কিংবা যদি উলাই'য়াহ্'র অধিকাংশ জনগণ অথবা তাদের প্রতিনিধি ওয়ালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন ওয়ালীকে পদচ্যুত করা যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দুটি কারণে উলাই'য়াহ্'র জনগণের পক্ষ থেকে একটি উলাই'য়াহ্ প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করা হবে। প্রথমতঃ তারা প্রদেশের বাস্তবতার ব্যাপারে ওয়ালীকে অবহিত করবেন; কারণ, তারা ঐ প্রদেশ বা অঞ্চলে বসবাস করেন এবং সে প্রদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে তারা ওয়ালীর চেয়ে ভাল ধারণা রাখেন। তখন ওয়ালী সে তথ্যসমূহ ব্যবহার করে আরও ভালভাবে তার কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। আর, দ্বিতীয়তঃ ওয়ালীর কাজের ব্যাপারে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। যদি অধিকাংশ কাউন্সিল সদস্য ওয়ালীর কাজের ব্যাপারে অভিযোগ করেন তাহলে খলিফা তাকে অপসারণ করবেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদ কায়েসের প্রতিনিধিদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরাইনের আমীর আল 'আলা ইবনে আল হাদরামীকে অপসারণ করেছিলেন। এছাড়া, কোন কারণ বা অভিযোগ ছাড়াও খলিফা ওয়ালীকে পদচ্যুত করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইয়েমেনের আমীর মুয়াজ বিন জাবালকে কোন কারণ ছাড়াই অপসারণ করেন।

উমর বিন আল-খাত্তাবও (রা.) ওয়ালীদের কারণে বা বিনা কারণে বরখাস্ত করতেন। তিনি যিয়াদ ইবনু আবু সুফিয়ানকে কোন কারণ ছাড়াই অপসারণ করেন এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে জনগণের অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্ত করেন এবং বলেন, "আমি তাকে অদক্ষতা বা বিদ্রোহের কারণে অপসারণ করিনি।" এ ঘটনাগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, খলিফা কোন ওয়ালীকে তার উলাই'য়াহ্র জনগণের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসুক বা না আসুক সর্বাবস্থায় অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন।

অতীতে দুই ধরনের উলাই'য়াহ্ ছিল: উলাই'য়াহ্তুল সালাহ্ এবং উলাই'য়াহ্তুল খারাজ। এ কারণে ইতিহাসের বইসমূহে উলাই'য়াহ্'র আমীর সম্বন্ধে আমরা দু'ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে দেখি: প্রথমটি হল সালাহ্ কিংবা খারাজ এর উপর কর্তৃত্ব (ইমারাহ্) এবং অন্যটি হল সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের উপর কর্তৃত্ব। অন্যভাবে বললে বলা যায়, শুধুমাত্র সালাহ্ কিংবা খারাজ এর উপর ওয়ালী নিযুক্ত করা যায়। আবার, সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের উপর আমীর নিযুক্ত করা যায়। উলাই'য়াহ্ অথবা ইমারার ক্ষেত্রে সালাহ্ শব্দটির অর্থ শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়া নয়, বরং এর অর্থ হল তহবিল বাদে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করা। কারণ, সালাহ্ শব্দটির অর্থ হল কর ধার্য করার এখতিয়ার ব্যাতিরেকে সব বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা। সুতরাং, যদি একজন ওয়ালীকে সালাহ্ এবং খারাজ উভয়ের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেটি সাধারণ উলাই'য়াহ্ (উলাই'য়াহ্ 'আম্মা) হিসেবে বিবেচিত হবে। আর, যদি তাকে শুধুমাত্র সালাহ্ বা খারাজ এর আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে

উলাই'য়াহ্টি বিশেষ উলাই'য়াহ্ (উলাই'য়াহ্ খাস্সা) হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে, যেভাবেই হোক না কেন প্রকৃতঅর্থে এটা খলিফার সিদ্ধান্তের উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ, তিনি ইচ্ছে করলে কোন উলাই'য়াহ্'কে শুধুমাত্র খারাজ অথবা বিচারব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন, কিংবা খারাজ, বিচারব্যবস্থা ও সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য কোনকিছুর মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। রাষ্ট্র বা উলাই'য়াহ্'কে পরিচালনার জন্য তিনি যে সিদ্ধান্তকে উপযোগী মনে করবেন সেটাই করতে পারেন। কারণ, হুকুম শারী'আহ্ ওয়ালীর জন্য কোনো দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং শাসনকার্যের সকল দায়িত্ব তার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি। শুধুমাত্র এটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ওয়ালী অথবা আমীরের দায়িত্ব শাসন ও কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত হবে এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করতে হবে।

এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বস্তুতঃ হুকুম শারী'আহ্ খলিফার জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক করেছে; তার বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে এই ওয়ালী উলাই'য়াহ্ আম্মা অথবা উলাই'য়াহ্ খাস্সা' যে কোন উলাই'য়াহ্'র জন্য নিযুক্ত হতে পারে। রাসূল (সাঃ)-এর কর্মকান্ড থেকে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাধারণভাবে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে ওয়ালী নিয়োগ করেছেন, যেমন আমরু বিন হাজেমকে তিনি (সাঃ) এভাবে ইয়েমেনে নিযুক্ত করেছিলেন। আবার, তিনি (সাঃ) বিশেষ দায়িত্ব দিয়েও ওয়ালী নিয়োগ করেছেন, যেমন আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে ইয়েমেনে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সীরাত ইবনে হিশামে উল্লেখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফারওয়া বিন মুসায়িককে মুরাদ, জুবায়ের ও মিদহাজ গোত্রের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন এবং তার সাথে তিনি (সাঃ) খালিদ বিন সায়ীদ বিন আল 'আসকে সাদাকা সম্পর্কিত বিষয়াবলী পরিচালনার ওয়ালী পদে নিয়োগ করেছিলেন। এটাও উল্লেখিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) যিয়াদ বিন লাবিদ আল আনসারীকে হাজরামাউতে ওয়ালী হিসাবে ও সাদাকার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এছাড়া, তিনি (সাঃ) আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে নাজরানে সাদাকা ও জিযিয়ার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। হাকীমের বর্ণনা অনুসারে, তিনি (সাঃ) আলী বিন আবি তালিব (রা.)-কে ইয়েমেনে বিচারকের দায়িত্ব দিয়েও প্রেরণ করেছিলেন। আল-ইসতিয়া'ব গ্রন্থে উল্লেখিত আছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুয়াজ বিন জাবালকে আল জানাদের লোকদের কুর'আন, ইসলামী আইন শিক্ষা দেয়া ও বিচার ফায়সালার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে ইয়েমেনের আমীলদের কাছ থেকে সাদাকা সংগ্রহের ক্ষমতাও দিয়েছিলেন।

যদিও খলিফার সাধারণ ও বিশেষ দু'ভাবেই ওয়ালী নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে, তবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, আব্বাসীয় খিলাফতের দুর্বলতার সময় সাধারণ উলাই'য়াহ্ ওয়ালীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসন করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছিল। যে সময়ে খলিফা নিতান্তই একটি নামসর্বস্ব পদবীতে পরিণত হয়েছিল, যাকে কেবলমাত্র জনসভায় দু'আর সময় স্মরণ করা হতো এবং মুদ্রায় তার নাম প্রতীক হিসাবে খোদাই করা থাকতো। এভাবেই, সাধারণ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল।

যেহেতু খলীফার সাধারণ ও বিশেষ কর্তৃত্ব দিয়ে ওয়ালী নিযুক্ত করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেহেতু সাধারণ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রকে ক্ষতির দিকে ধাবিত করতে পারে এবং রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে, তাই আমরা বিশেষ উলাই'য়াহ্ ব্যবস্থা বা উলাই'য়াহ্ খাস্সা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেন ওয়ালীর তাকওয়া যদি কখনো নিম্নগামীও হয় তাহলেও যেন তিনি রাষ্ট্রকে বিভক্ত করতে না পারেন। গবেষণা থেকে আমরা দেখেছি, যে সকল ক্ষেত্র ওয়ালীকে শক্তিশালী করে সেগুলো হল সেনাবাহিনী, বিচারব্যবস্থা ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ। সেজন্য, এ ক্ষেত্রগুলোকে অবশ্যই ওয়ালীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত খলিফার অধীনে রাখতে হবে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রগুলো অবশ্যই খলিফার প্রত্যক্ষ নজরদারিতে রাখতে হবে।

ওয়ালীকে এক উলাই'য়াহ্ থেকে অন্য উলাই'য়াহ্'তে স্থানান্তরিত করা যাবে না, বরং তাকে এক উলাই'য়াহ্'র দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে, তারপর অন্য উলাই'য়াহ্তে পুনঃনিয়োগ দিতে হবে। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কর্মকান্ড থেকে পরিষ্কার যে, তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতেন। এরকম কোনো বর্ণনা নেই যে, যেখানে দেখা যায় তিনি (সাঃ) ওয়ালীদের এক উলাই'য়াহ্ থেকে অন্য উলাই'য়াহ্'তে স্থানান্তর করেছিলেন। এছাড়া, উলাই'য়াহ্ হলো এমন এক ধরনের চুক্তি যার ধারাসমূহ সুস্পষ্ট। সেকারণে একটি অঞ্চল বা প্রদেশে উলাই'য়াহ্ নিয়োগের চুক্তিতে যে সীমানা পর্যন্ত ওয়ালীর শাসন বিরাজমান থাকবে তা পরিস্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে এবং খলিফা তাকে অপসারণ করার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত অঞ্চলে তার শাসনক্ষমতা বলবৎ থাকবে। কোনো একটি অঞ্চল থেকে তাকে অপসারণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে অঞ্চলের ওয়ালী বলেই গণ্য হবেন। তাকে যদি অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তর করা হয় তার মাধ্যমে তিনি পূর্বের পদ থেকে অপসারিত হবেন না কিংবা নতুন জায়গার ওয়ালীও হবেন না। কারণ, প্রথম পদ থেকে তাকে অপসারণ করতে হলে সুস্পষ্টভাবে সেই উলাই'য়াহ্'র দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে এবং একইভাবে নতুন উলাই'য়াহ্'তে তার নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে নিয়োগের চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে সেই বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে উল্লেখ থাকতে হবে। সেকারণে একজন ওয়ালীকে স্থানান্তর করা যায় না, বরং প্রথমে নিযুক্ত পদ থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের পরই নতুন স্থানে তাকে পুনঃনিয়োগ দেয়া যায়।

খলিফাকে ওয়ালীদের কাজের নিয়মিত তদন্ত করতে হবে:

খলিফাকে ওয়ালীদের কাজ তদন্ত করতে হবে এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এ কাজটি খলিফা প্রত্যক্ষভাবে করতে পারেন অথবা তিনি তার পক্ষ থেকে কাউকে এ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করতে পারেন। মু'ওয়ায়ীনও (প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী) খলিফাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালীদের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তবে, এ ব্যাপারে তার অনুসন্ধান লব্ধ তথ্য ও গৃহীত সিদ্ধান্ত অবশ্যই খলিফাকে অবহিত করতে হবে – যা প্রতিনিধিত্বকারী সহকারীর দায়িত্বের অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে খলিফাকে বিভিন্ন প্রদেশসমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং নিয়মিতভাবে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, তাকে বিভিন্ন সময়ে ওয়ালীদের সবার সাথে অথবা কিছু সংখ্যকের সাথে বসে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগও শুনতে হবে।

এটা নিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়ালীদের নিয়োগের সময় তাদের যাচাই করে নিতেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন মুয়াজ ও আবু মুসার ক্ষেত্রে। তিনি (সাঃ) সাধারণত কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে সে ব্যাপারে তাদের নির্দেশনা প্রদান করতেন, যেমনটি তিনি (সাঃ) করেছিলেন আমর বিন হাজম-এর ক্ষেত্রে। এছাড়া, তিনি (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যেমনটি তিনি (সাঃ) করেছিলেন আবান বিন সা'ঈদ এর ক্ষেত্রে। তাকে বাহরাইনে ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার সময় তিনি (সাঃ) বলেছিলেন,

"আবদ কায়েসের দেখাশোনা করো এবং এর প্রধানদের সম্মান করো।"

এছাড়াও তিনি (সাঃ) ওয়জালীদের জবাবদিহি করতেন, তাদের অবস্থা

...০৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

...২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা...

থেকে সংগৃহীত না হয় তাহলে এটির এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে এবং গুপ্তধনের (রিকায্) ক্ষেত্রেও একই বিষয়।"

অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মতো বাতাসে মিশে থাকা কোন কিছু সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সেগুলোকে ভূ-গর্ভস্থ হতে উৎপাদিত বস্তুসমূহের মতো একইভাবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট যে জিনিসকে শারী'আহ্ মুবাহ্ ঘোষণা করেছে এবং যেটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ করে দেয়নি সেটির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

শিকার

শিকার করা হচ্ছে আরেক ধরনের কাজ। মাছ, মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ (এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী) এবং অন্যান্য শিকার হওয়া প্রাণীর মালিকানা লাভ করবে শিকারী; পাখি বা পশু, কিংবা যমিন হতে শিকার করা কোন কিছুর মালিকও হবে শিকারকারী ব্যক্তি। আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহ্রামরত অবস্থায় থাক ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার।" [সূরা মায়িদাহ্ : ৯৬]

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যখন তোমরা এহ্রাম ভেঙ্গে ফেল, তখন তোমাদের জন্য শিকার করা অনুমোদিত।" [সূরা মায়িদাহ্ : ২]

এবং তিনি (সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেন:

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিন: তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান করো শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করো..." [সূরা মায়িদাহ্ : ৪]।

এবং আবু সা'লাবা আল-খাসনী বর্ণনা করেছেন যে, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম: 'হে আল্লাহ্'র নবী! আমরা শিকারের জন্য উপযোগী ভূমিতে বসবাস করি, আমি তীর এবং প্রশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত কুকুরের মাধ্যমে শিকার করি, সুতরাং আপনি আমাকে বলে দিন যে, এদের কোনটি আমার জন্য অনুমোদিত?" তিনি (সাঃ) বলেন: **"তোমার দেয়া বর্ণনা অনুসারে, তুমি একটি শিকার উপযোগী ভূমিতে বসবাস করো; সুতরাং তুমি আল্লাহ্'র নামে তোমার তীর দিয়ে যা শিকার করো তা থেকে ভক্ষণ করো, এবং তুমি যদি আল্লাহ্'র নামে তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে শিকার করো, তাহলে শিকারের সময় ও সেটি খাবারের সময় আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণ করো, এবং তুমি যদি তোমার অপ্রশিক্ষিত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করো এবং মৃত্যুর পূর্বে শিকারটিকে সংগ্রহ ও জবাই করতে পারো তবে তা থেকে ভক্ষণ করো।"** (আন-নিসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত)

দালালি এবং কমিশন এজেন্সী (সামসারা এবং দালালা)

দালাল হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যাকে অন্যান্য ব্যক্তি তাদের পক্ষ হয়ে কোন কিছু ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ করে থাকে। একজন কমিশন এজেন্টকেও এভাবেই নিয়োগ দেয়া হয়। সামসারা (দালালি) হল এমন এক ধরনের কাজ যার মাধ্যমে কোন সম্পত্তি বৈধভাবে অধিকৃত হয়। আবু দাউদ তার সুনানে উল্লেখ করেছেন যে, কায়েস ইবনে আবু ঘুরজা আল-কাননী বলেছেন: আমরা মদীনাতে আউসাক (বোঝাই করা মালামাল) ক্রয় করতাম এবং নিজেদেরকে দালাল বলে অভিহিত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদেরকে আগের চেয়ে উত্তম একটি নামে ডাকলেন। তিনি (সাঃ) বলেন: **"হে বণিকগণ, সাধারণত ব্যবসা হচ্ছে মূর্খ কথাবার্তা ও শপথের কালিমাযুক্ত, সুতরাং একে সাদাকার সাথে মিশ্রিত করো।"** এর অর্থ হলো, ব্যবসায়ীরা তার পণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনভাবে সীমালঙ্ঘন করে যে, তা মূর্খতার পর্যায়ে পড়ে যায় এবং পণ্যকে বিক্রয় করার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলে। তাই তার কাজের প্রতিফল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাদাকা দেয়া অধিকতর পছন্দনীয়। ক্রয়-বিক্রয়ের যে কাজের জন্য লোকটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেটি সুনির্দিষ্ট হতে হবে, এটি হতে পারে পণ্যের ভিত্তিতে কিংবা সময়ের ভিত্তিতে। সুতরাং, কেউ যদি একটি বাড়ী বা কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য কাউকে একদিনের জন্যও নিয়োগ দেয় তবে সেটি বৈধ হবে। কিন্তু সে যদি অনির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ দেয় তবে তা অবৈধ হবে।

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির কিছু কাজের ক্ষেত্রে দালালি প্রযোজ্য নয়। যেমন: এক ব্যবসায়ী অন্য আরেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য একজন এজেন্ট নিয়োগ দিলো, এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে ক্রয় করার প্রতিদানে এজেন্টকে কিছু অর্থ প্রদান করলো। যদি এজেন্ট এই অর্থ পণ্যের মূল্য থেকে বাদ না দিয়ে নিজের জন্য কমিশন হিসেবে রেখে দেয় তবে শারী'আহ্ এটিকে দালালি হিসেবে অনুমোদন দেয় না, কারণ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ব্যবসায়ীর জন্য একজন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তাই পণ্যের মূল্য যতটুকু কমানো হয় তা নিয়োগকারী ব্যবসায়ীর জন্য, এজেন্টের জন্য নয়। অতএব, এজেন্টের জন্য এই অর্থ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, কারণ তা ক্রেতার অধিকারভুক্ত, যদি ক্রেতা তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবেই তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে।

একইভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করার জন্য তার বন্ধু বা ভৃত্যকে প্রেরণ করে এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করার জন্য বন্ধু বা ভৃত্যকে কোনো সম্পত্তি প্রদান করে, অর্থাৎ কমিশন প্রদান করে তবে সে বন্ধু বা ভৃত্যের জন্য তা গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়, কারণ সেটা দালালি নয়, বরং সেটা প্রেরণকারী ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে চুরি হিসেবে বিবেচিত হবে। এর কারণ হলো, এ সম্পত্তি তারই যে তাকে ক্রয় করতে পাঠিয়েছে এবং কখনই যাকে পাঠানো হয়েছে তার জন্য নয়।

মুদারাবা

মুদারাবা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ব্যবসায় অংশগ্রহণ, যাতে একজন মূলধন এবং অন্যজন শ্রম বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির শ্রমের সাথে আরেকজন ব্যক্তির সম্পত্তি অংশীদারিত্বে উপনীত হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, একজন কাজ করবে এবং অন্যজন সম্পত্তি বিনিয়োগ করবে। সুনির্দিষ্ট পরিমাণে লাভ ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যাপারে দু'জন অংশীদার একমত হয়। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, যখন একজন ব্যক্তি এক হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করে ও অন্যজন সেটা দিয়ে কাজ করে এবং প্রাপ্ত লাভ তাদের দু'জনের মধ্যে বন্টিত হয়। শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদারকে অর্থ হস্তান্তর করতে হবে এবং অর্থের উপর তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কারণ মুদারাবাতে শ্রম বিনিয়োগকারী ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করে দিতে হয়। শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদার সম্পদ বিনিয়োগকারী অংশীদারের উপর এমন শর্তারোপ করতে পারে যে, লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক তাকে দিতে হবে, কিংবা লভ্যাংশের সুনির্দিষ্ট অংশ ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে।

এটি একারণে যে, মুদারিব বা শ্রম বিনিয়োগকারী অংশীদার তার কাজের জন্য লভ্যাংশে অধিকার দাবী করতে পারে। অতএব, অংশীদারদের জন্য এটা অনুমোদিত যে তারা মুদারিবের অল্প অথবা অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ প্রাপ্তির বিষয়ে একমত হতে পারে। সুতরাং, মুদারাবা এমন এক ধরনের কারবার যা মালিকানা অর্জনের বৈধ পন্থা। এর ফলে মুদারিব সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে পারে, যা সে পারস্পরিক ঐক্যমত্য অনুযায়ী কাজ করে মুদারাবার মাধ্যমে লভ্যাংশ হিসেবে অর্জন করে থাকে।

মুদারাবা হচ্ছে একধরনের কোম্পানী, কারণ এটা হচ্ছে শ্রম ও সম্পদের অংশীদারিত্ব। শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত লেনদেনসমূহের একটি হচ্ছে এধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আল্লাহ্ বলেন: 'দুইজন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়জন, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আরেকজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যদি তাদের একজন আরেকজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আমি নিজেকে সেখান থেকে অপসারণ করে নেই।"** রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আল্লাহ্'র হাত ততক্ষণ পর্যন্ত দুইজন অংশীদারের উপর থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।"** আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি কোনো সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে হস্তান্তর করেন তখন তিনি মুদারিবের উপর শর্তারোপ করতেন যে, এটি নিয়ে সে সমুদ্রে ভ্রমণ করতে পারবে না, কোনো উপত্যকায় অবরোহণ করতে পারবে না, কিংবা জীবন্ত কোনো কিছু নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না, অন্যথায় সে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে জানতেন এবং তিনি (সাঃ) এটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। সাহাবীগণ (রা.) নিরঙ্কুশভাবে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুদারাবা অনুমোদিত। সাধারণত উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা.) এতিমদের সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে হস্তান্তর করতেন। উসমান ইবনে আফফান (রা.) কিছু সম্পত্তি মুদারাবা হিসেবে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করেন। সুতরাং, মুদারিব অন্য একজনের সম্পত্তিকে ব্যবহার করে সম্পত্তি অর্জন করে থাকে। অতএব, মুদারিব কর্তৃক সম্পাদিত মুদারাবা হচ্ছে একধরনের কাজ এবং মালিকানা অর্জনের একটি বৈধ পন্থা। সম্পদের মালিকের জন্য এটি মালিকানা অর্জনের পন্থা নয়, বরং এটি মালিকানা বিনিয়োগের একটি মাধ্যম।

বর্গাচাষ (মুসাকাত)

কাজের আরেকটি ধরন হচ্ছে মুসাকাত, যাতে একজন ব্যক্তি তার গাছসমূহকে সেচ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করার জন্য কারো কাছে সেগুলো হস্তান্তর করে এবং এর বিনিময়ে তাকে গাছগুলো থেকে প্রাপ্ত ফলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে। এটাকে বলা হত মুসাকাত (পারিভাষিক অর্থ সেচকার্য), কেননা এটি সেচকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট; হিজাজের লোকদের গাছে প্রচুর পরিমাণে সেচ প্রয়োজন হতো, আর তারা তা কূপ থেকে সংগ্রহ করতো। মুসাকাত এমন এক ধরনের কাজ যা শারী'আহ্ কর্তৃক অনুমোদিত। মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন: **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খায়বারের লোকদের সাথে অর্ধেক ফল ও বৃক্ষের ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।"** মুসাকাত সাধারণত তাল গাছ ও লতাজাতীয় গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য – যার ফসলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদেরকে দেয়া হয়। এটা শুধুমাত্র ফলবান গাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসব গাছে ফল উৎপন্ন হয় না, যেমন: উইলো, কিংবা ফল হলেও তা সংগ্রহ করা হয় না, যেমন: পাইন ও সিডার, সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত প্রযোজ্য নয়, কারণ মুসাকাত ফলের একটি অংশের জন্য প্রযোজ্য এবং এ ধরনের গাছ হতে কোনরূপ ফল অন্বেষন করা হয় না। কিন্তু যেসব গাছ হতে পাতা অন্বেষণ করা হয়, যেমন: তুঁত ও গোলাপ গাছ, সেগুলোর ক্ষেত্রে মুসাকাত প্রযোজ্য, কারণ এগুলোর পাতা ফলের সমপর্যায়ের। এগুলো থেকে বছরান্তে ফসল পাওয়া যায় এবং এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব, এবং এগুলোর একটি অংশের বিনিময়ে মুসাকাতে প্রবেশ করা যায়, আর একারণে ফলের মতই এক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য।

একজন কর্মচারী বা শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান

ইসলাম একজন ব্যক্তিকে তার হয়ে কাজ করার জন্য কর্মচারী ও শ্রমিক, অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান করেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"এই পৃথিবীতে আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি এবং একের পদমর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে কিছু ব্যক্তি অপরকে তাদের কাজে নিয়োগ দিতে পারে..." [সূরা যুখ্‌রুফ : ৩২]

ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়াহ্ ইবনে আজ-জুবায়ের বলেছেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন: **"রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং আবু বকর (রা.) বনু আদ-দীল থেকে অভিজ্ঞ পথ নির্দেশক হিসেবে এক ব্যক্তিকে ভাড়া করেছিলেন, যে তখনও কুরাইশদের কুফ্‌ফার দ্বীনের মধ্যে ছিল। তারা তার কাছে তাদের দু'টি ভারবাহী মাদী উট হস্তান্তর করলেন এবং তিনরাত পর সকালবেলা দু'টি উটসহ সাওর-এর গুহায় তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় ধার্য করলেন।"**

এছাড়াও, আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে।" [সূরা ত্বালাক : ৬]

আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আল্লাহ্ আজ ওয়া যাল্লা বলেন: বিচার দিবসে আমি তিন ধরনের ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হবো: একজন হলো সে ব্যক্তি যে আমার নামে কাউকে কোনো কথা দিলো এবং পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করলো, যে একজন আজাদ ব্যক্তিকে বিক্রয় করলো এবং এর মূল্য গ্রাস করল এবং যে ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য কাউকে ভাড়া করলো এবং পুরো শ্রম দেয়ার পরও তাকে তার পারিশ্রমিক দিলো না।"** নিয়োগ প্রদানের অর্থ হচ্ছে, নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগকারীকে কোন সুবিধা প্রদান করে এবং এর বিনিময়ে নিয়োগকারী হতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পদ লাভ করে। সুতরাং এটিকে এমন একটি চুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যায় যেখানে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিনিময়ে উপযোগ (কাজ হতে প্রাপ্ত সুবিধা) পাওয়া যায়। শ্রমিকের কাজের উপযোগের উপর ভিত্তি করে অথবা শ্রমিকের উপকারিতার কথা বিবেচনা করে একজন শ্রমিককে ভাড়া করার চুক্তি করা হয়। যদি চুক্তিটি কাজের উপযোগের উপর নির্ভর করে সম্পাদন করা হয় তবে চুক্তিকৃত বিয়য়টি হলো কাজ দ্বারা সৃষ্ট উপযোগ, যেমন: কোন বিশেষ কাজের জন্য কারিগর ভাড়া করা, পরিচ্ছনতা কর্মী ভাড়া করা, কামার বা ছুতার ভাড়া করা। তবে চুক্তিটি যদি ব্যক্তির নিজস্ব মানবীয় উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে করা হয় তাহলে চুক্তির বিষয়বস্তু হলো ব্যক্তির উপযোগিতা, যেমন: একজন ভৃত্যকে ভাড়া করা এবং এধরনের সকল শ্রমিক। এ ধরনের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগকারীর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করে, যেমন: যে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটি কারখানা বা বাগানে কাজ করে, কিংবা একজন কৃষক। সরকারী কর্মচারীরা এর আওতায় পড়ে। বিকল্পভাবে, একটি সুনির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে তার দক্ষতা থাকতে পারে, মজুরির বিনিময়ে যেকোন ব্যক্তির জন্য কাজটি সে করে দিতে পারে। এ ধরনের কাজের উদাহরণ হলো ছুতার, দর্জি ও মুচীর কাজ। প্রথম ধরনের কাজ হলো ব্যক্তি পর্যায়ের কাজ এবং দ্বিতীয় ধরনের কাজ হল সাধারণ শ্রম।

(...চলবে)

■

বই অনুবাদ : গত সংখ্যার পর থেকে...

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

লেখক: হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতিষ্ঠাতা – শাইখ তাক্বি উদ্দীন আন-নাবাহানি

অধ্যায় ৪

মালিকানা লাভের প্রথম উপায়: কাজ ('আমাল)

যেকোন ধরনের সম্পত্তি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেগুলো অর্জনের জন্য কাজ করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে সম্পত্তিসমূহ প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যেতে পারে, যেমন: মাশরুম, কিংবা সেগুলো মানুষের শ্রম দ্বারা তৈরী হতে পারে, যেমন: এক টুকরো রুটি বা একটি গাড়ি।

'আমাল (কাজ) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অনেকগুলো ধরন ও রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল বিদ্যমান। সেজন্য শারী'আহ্ 'আমাল বা কাজ শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা ব্যতিরেকে এটির প্রচলিত ধ্রুপদী অর্থের উপর ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও, শারী'আহ্ 'আমাল শব্দটিকে সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি, বরং বিশেষ কিছু কাজ হিসেবে এটিকে উপস্থাপিত করেছে। এটি কাজের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং সেগুলোই মালিকানা অর্জনের উপায় হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। কাজ সম্পর্কিত ঐশী হুকুমসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সম্পত্তি অর্জনের উপায় হিসেবে আইনগতভাবে বৈধ কাজসমূহ নিম্নরূপ:

১. অব্যবহৃত (নিষ্ফলা) ভূমির চাষাবাদ
২. ভূ-গর্ভে বা বাতাসের মধ্যে যা পাওয়া যায় তা আহরণ করা
৩. শিকার
৪. দালালি (সামসারা) এবং কমিশন এজেন্ট (দালালা)
৫. শ্রম ও মূলধনের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব (মুদারাবা)
৬. বর্গাচাষ (মুসাকাত)
৭. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের জন্য কাজ করা

নিষ্ফলা জমিতে চাষাবাদ (ইহ্‌ইয়া উল-মাওয়াত)

নিষ্ফলা জমি (মাওয়াত) হলো এমন এক ধরনের ভূমি যার কোন মালিক নেই এবং যা থেকে কেউ উপযোগ লাভ করছে না। এতে চাষাবাদের অর্থ হলো বৃক্ষরোপন করা, বনায়ন করা বা এর উপর ইমারত নির্মাণ করা। ভিন্নভাবে বলা যায় যে, জমিটির যে কোন প্রকারের ব্যবহারের অর্থই হলো সেটিকে আবাদ করা (ইহ্‌ইয়া)। কেউ এ ধরনের ভূমি আবাদ করলে সে এর মালিক হিসেবে পরিগণিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোনো নিষ্ফলা জমিতে আবাদ করবে সেটি তার হয়ে যাবে।"** তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোন একটি ভূমিকে বেড়া দ্বারা ঘেরাও করে ফেলে সেটি তার।"** এবং, তিনি (সাঃ) বলেছেন: **"অন্য কোন মুসলিমের পূর্বে যে কেউ কোন কিছুর উপর হাত রাখলে সেটা তার হয়ে যাবে।"** এক্ষেত্রে একজন মুসলিম ও জিম্মীর (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেননা এ হাদিসটি কোন ধরনের সীমাবদ্ধতা ছাড়া অর্থগত দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ; এবং যেহেতু একজন জিম্মী উপত্যকা, বন এবং পাহাড়ের উপর থেকে যাই গ্রহণ করুক না কেন সেটি তারই, সেহেতু সেগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অনুমোদিত নয়। নিষ্ফলা জমি তার সম্পত্তি হওয়ার ক্ষেত্রেও হাদিসটি প্রযোজ্য। সব ভূমির ক্ষেত্রেই এই নিয়ম সাধারণভাবে প্রযোজ্য – হোক সেটা দারুল ইসলাম বা দারুল হারব্, কিংবা উশরী বা খারাজী ভূমি। তবে মালিকানা লাভের শর্ত হলো যে, জমিটি অধীনে আসার পর তিনবছরের মধ্যে সেটিতে কাজ করতে হবে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে জমিটির আবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। যদি কেউ জমি অধিকারে আসার প্রথম তিন বছরের মধ্যে আবাদ না করে, বা পরবর্তীতে টানা তিন বছর ব্যবহার না করে তবে সে সেটির মালিকানার অধিকার হারাবে। উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) বলেছেন: "কোন ব্যক্তি জমিতে বেড়া দিয়ে মালিকানা অর্জন করতে পারে, তিন বছর পর্যন্ত অনাবাদী রাখলে সে জমিটির মালিকানা হারাবে।" অন্যান্য সাহাবাদের (রা.) উপস্থিতিতে উমর (রা.) এই উক্তি করেছিলেন এবং এই আইন প্রয়োগ করেছিলেন, সাহাবীরা (রা.) এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি – যা তাদের ইজ্‌মাকে সুনিশ্চিত করে।

ভূগর্ভে যা আছে তা আহরণ

আরেক প্রকারের কাজ হচ্ছে ভূ-গর্ভ হতে এমন ধরনের সম্পদ আহরণ করা যা কোন সম্প্রদায়ের টিকে থাকার নিয়ামক নয়, এগুলো লুক্কায়িত বা গুপ্তধন হিসেবে পরিচিত (রিকায্)। ফিকহ্-এর ব্যবহৃত পরিভাষা অনুসারে এ ধরনের সম্পদে মুসলিমদের সামষ্টিক কোনো অধিকার থাকে না। বরং, যদি কেউ কোন গুপ্তধন খুঁজে পায় তবে সেটার চার-পঞ্চমাংশ ঐ ব্যক্তির এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।

তবে এটি যদি কোনো সম্প্রদায়ের সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হয় এবং সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের অধিকার হয় তাহলে এটি গণমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যা এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে তা হলো, যদি কোনো সম্পদ মানুষ যমিনে লুকিয়ে রাখে, কিংবা এর পরিমাণ এতো সামান্য যে তা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়, তবেই এটি গুপ্তধন হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যা আদতে ভূ-গর্ভস্থ ছিল এবং সম্প্রদায়ের সকলের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা রিকায্ নয় বরং গণমালিকানাধীন সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, যা সত্যিকারভাবে মাটিতে পাওয়া যায় এবং সকলের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, যেমন: পাথরের খনি, যা থেকে দালান নির্মানের পাথর এবং এজাতীয় কোন কিছু তৈরী হয়, তা রিকায্ বা গণমালিকানাধীন সম্পত্তি কোনটি হিসেবেই বিবেচিত হবে না, বরং তা ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। রিকায্-এর মালিকানা লাভ এবং এর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসেবে প্রদানের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আমর ইবনে শু'য়াইব তার পিতার কাছ থেকে ও তার পিতা তার দাদার কাছ থেকে আল-নিসাইতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্'কে (সাঃ) লুকাতাহ্ (যা মাটি থেকে সংগৃহীত হয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাঃ) বলেন: **"যদি এটা কোনো ব্যবহৃত রাস্তা বা মানববসতিপূর্ণ গ্রাম থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে এ ব্যাপারে বর্ণনা দিতে হবে এবং ঘোষণা দিয়ে একবছর কাল অপেক্ষা করতে হবে। যদি এর মালিক একে শনাক্ত করতে পারে তাহলে এটি তার জিম্মায় চলে যাবে, অন্যথায় এটি তোমার। আর যদি এটি কোন ব্যবহৃত রাস্তা বা মানববসতিপূর্ণ গ্রাম**

...২২ পৃষ্ঠায় দেখুন

“তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

“তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর আল্লাহ্ তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন, তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্’র ইচ্ছায় এরও অবসান ঘটবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত – নবুয়্যতের আদলে।” *(মুসনাদে আহমদ, খন্ড ৪, হাদীস নং-১৮৫৯৬)*